দাম : ষোলো টাকা

# স্বস্তিকা

সংহতির উৎসব
রথযাত্রা
— পৃঃ ২৩

ভারতের অর্থনীতি পাঁচ
ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর
লক্ষ্য কতটা বাস্তবসম্মত
— পৃঃ ১৩

৭৫ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা।। ১৯ জুন, ২০২৩।। ৩ আষাঢ় - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।।
website : www.eswastika.com

## রথযাত্রা
## সংহতির উৎসব

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

# স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ৩ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১৯ জুন - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com


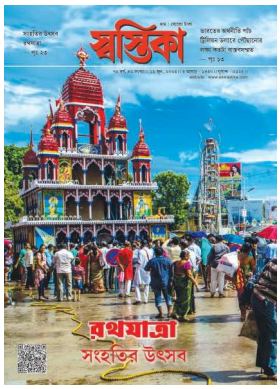



**সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

**সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)**

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩**

**দাম : ১৬ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


# সূচিপত্র


সম্পাদকীয় ☐ ৫

**দাঁড়কাক কোকিল হয় না আর এক চাকায় রথ চলে না**

☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

**আগামী দেখাচ্ছেন মোদী, দিদি কি দেখতে পাচ্ছেন?**

☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

**চলচ্চিত্র নির্মাতারা অতি দ্রুত ছক্কা মারতে গিয়ে ঐতিহাসিক সূত্রটি হারিয়ে ফেলছেন ☐ বৈভব পুরন্দরে ☐ ৮**

**উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে গোপাচার ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০**

**ঈশ্বরের নিজের দেশে অধর্মের পাহাড়**

☐ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ☐ ১১

**ভারতের অর্থনীতি পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর লক্ষ্য কতটা বাস্তবসম্মত ☐ ড. রতন কুমার ঘোষাল ☐ ১৩**

**বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার সোনালি সময় চলছে**

☐ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ১৭

**সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরে আজও টিকে রয়েছে টোটো উপজাতির মানুষরা ☐ তরুণ কুমার পণ্ডিত ☐ ১৮**

**সংহতির উৎসব—রথযাত্রা ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ২৩**

**রথের রজ্জু ও রাধারাণী ☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ২৭**

**শ্রীশ্রী জগন্নাথস্বামীর রথযাত্রার কথা**

☐ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ৩১

**জনজাতি মহানায়ক ভগবান বীরসা মুণ্ডা ☐ ৩৪**

**পশ্চিমবঙ্গ কীভাবে পুরোনো গরিমায় ফিরে এসে সুদিন ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হবে? ☐ সুদীপ্ত গুহ ☐ ৩৫**

**বামপন্থীরা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে**

☐ পল্লব মণ্ডল ☐ ৪৩

**পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র এখন উলঙ্গ ☐ সুবল সরদার ☐ ৪৬**

**চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ ☐ চিত্রকথা : ৫০**

প্রকাশিত হবে ২৬ জুন, ২০২৩

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৬ জুন, ২০২৩

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

### রেল দুর্ঘটনা মোকাবিলায় কেন্দ্র

কলমণ্ডল, যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস ও মালগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের পর কেউ কেউ রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন। কিন্তু রেলমন্ত্রী প্রমাণ করেছেন তাঁর মতো দক্ষ, পেশাদার টেকনোক্র্যাট শুধু দেশে কেন, বিদেশেও বিরল। বিদেশেও অনেকের চোখ কপালে উঠেছে। তাঁরা ভাবছেন, ভারত কীভাবে এত অল্প সময়ে এত বড়ো রেল দুর্ঘটনার মোকাবিলা করল! স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে এর উৎস সন্ধান। লিখবেন— মনীন্দ্রনাথ সাহা, ড. রাজলক্ষ্মী বসু প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
**SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
**INDIAN OVERSEAS BANK**
Branch : **Sreemani Market**
**Kolkata-700 006**

## একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

**সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—**

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

# সম্পাদকীয়

## চরৈবেতি চরৈবেতি

কঠোপনিষদে যম-নচিকেতা সংবাদে রথ ও রথীর উল্লেখ রহিয়াছে। সেখানে মানব শরীরকে রথ, আত্মাকে রথী, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে বলগা এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব বলা হইয়াছে। শরীররূপী এই রথের যাত্রা আবহমানকাল ধরিয়া মানুষকে দেবত্বের অভিমুখে লইয়া চলিয়াছে। দেহরথকে সত্যপথে পরিচালনা করিয়া লক্ষ্যপথে লইয়া যাইবার প্রচেষ্টার মধ্যেই রহিয়াছে মানব জীবনের সার্থকতা। রথ হইল গতিশীলতার প্রতীক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে, চরন বৈ মধুবিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্ , অর্থাৎ সতত চলমান ব্যক্তিই মধু লাভ করিতে পারেন। চলমান ব্যক্তিই সুস্বাদু ফলের আস্বাদন করিতে পারেন। জীবনের সফলতা নিরন্তর যাত্রার মধ্যেই রহিয়াছে। উপনিষদে বলা হইয়াছে, মানুষের মধ্যেই চার যুগের অবস্থান রহিয়াছে। ব্যক্তি যখন নিষ্ক্রিয়, আলস্য-জর্জরিত, একপ্রকার সুপ্তাবস্থায় মগ্ন থাকে, তখন সে কলিযুগে অবস্থান করে। তারপর সে যখন জাগ্রত অর্থাৎ সতর্ক হয় তখন তাহার দ্বাপরযুগের শুরু। যখন লক্ষ্য স্থির করিয়া তাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়েন তখন তাহার ত্রেতাযুগ শুরু হয় এবং যখন লক্ষ্য পূর্তির উদ্দেশে চলিতে শুরু করেন অর্থাৎ সৎকর্মে প্রবৃত্ত হন, তখনই তিনি সত্যযুগে প্রবেশ করিয়া থাকেন। শরীররূপী এই দেহরথের যে কোনো প্রকারের যাত্রার অভিমুখই হইল সত্যযুগ। রথযাত্রার রথ শুধুমাত্র একটি প্রাচীন যান নহে। ইহার পশ্চাতে বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। রথ সম্পূর্ণভাবে মানব শরীরের প্রতীক। রথ যেমন কয়েকশত কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা নির্মিত হয়, মানব শরীরের কাঠামোও তদ্রূপ কয়েকশত অস্থিখণ্ড দ্বারা নির্মিত হয়। রথের কাঠামোতে প্রাণপ্রতিষ্ঠিত হয় বিগ্রহ অধিষ্ঠানের পরেই। বিগ্রহই রথের আত্মা। মানব শরীরও সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে অন্তরাত্মা জাগ্রত হইয়া পরার্থে নিবেদিত হইলেই। কেহ কেহ রথযাত্রাকে চলমান মহাকালের প্রতীক রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

বস্তুত, রথযাত্রা শুধুমাত্র ভগবানের যাত্রা নহে। ভক্ত ও ভগবান উভয়েরই। এই যাত্রায় ভগবান তাঁহার আসন হইতে নামিয়া আসেন ভক্তের মাঝে। ভক্ত ও ভগবান এইদিন মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যান। রথযাত্রা তাই সর্বশ্রেণীর মানুষের মহামিলন মেলা। সেখানে ছোঁয়াছুঁয়ি, উচ্চ-নীচের কোনো ভেদ থাকে না। সেইদিন এক-একটি মেলাপ্রাঙ্গণ মহাভারতে পরিণত হইয়া প্রেমের বৃন্দাবন হইয়া ওঠে। রথের রশি স্পর্শ করিবার জন্য মানুষ সেদিন ক্ষুদ্র আমি, বৃহৎ আমি বিসর্জন দিয়া শুধুমাত্র ভক্তে পরিণত হইয়া যান। প্রকৃতপক্ষে প্রভু জগন্নাথই তো ভারতবর্ষ। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারত সংস্কৃতিকে আরও সম্মুখে লইয়া যাইবার বার্তাই তো বহন করিতেছে রথযাত্রা। সেই কোন অনাদি অতীত হইতে যাত্রা শুরু করিয়া অদ্যাবধি নিরন্তর চলিতেছে ভারতবর্ষ। এই যাত্রা শুধু ভারতের উত্থানের জন্য নহে, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য। নিরন্তর চলিতে চলিতে ভারত সংস্কৃতির আজ বিশ্বসঞ্চার ঘটিয়াছে। প্রভু জগন্নাথের রথ বিশ্বের দেশে দেশে চলিতেছে। এই রথ যুদ্ধের রথ নহে, বিশ্বপ্রেমের। ভগবান বুদ্ধের বিগ্রহ রথোপরি স্থাপন করিয়া বৌদ্ধরথযাত্রারও আয়োজন ভারত-সহ বৌদ্ধদেশগুলিতে করা হয়। বৌদ্ধরথের জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা হইলেন যথাক্রমে অমিতাভ বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম। রথযাত্রা হইল ভারতের সহিত বিশ্বের মিলনের মাধ্যম। বিশ্ব আজ একটুকু শান্তির জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী। তাহারা 'জয় জগন্নাথ' অথবা 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া রথের রজ্জু স্পর্শ করিয়া ভারতপ্রেমে মাতোয়ারা হইতেছেন। চরৈবেতি, চরৈবেতি— ভারতের রথাযাত্রা সগৌরবে চলিতেছে, চলিবে।

## সুভাষিতম্

**দ্বৌ অভ্যসি নিবেষ্টব্যৌ গলে বদ্ধা দৃঢ়াং শিলাং।**
**ধনবন্তম্ অদাতারম্ দরিদ্রং চ অতপস্বিনম্।।**

দুই ধরনের লোকের গলায় বড়ো পাথর বেঁধে গভীর সমুদ্রে ফেলে দেওয়া উচিত। এক, ধনশালী হয়েও যে দান করে না এবং দুই, দরিদ্র হয়েও যে পরিশ্রম করে না।

# দাঁড়কাক কোকিল হয় না আর এক চাকায় রথ চলে না

**নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়**

'সে এক দাঁড়কাকের সাধ হলো কোকিলা সাজিতে। পড়ল ধরা কা কা রবে তার সে জারি জুরিতে'। জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের একটি চটুল গান ধার করেই এই লেখার শুরু। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। গ্রাম দখলের লড়াই। এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দলেদের ঘোষণাপত্র থাকে না। সবটাই প্রশাসন আর রাজ্য পুলিশ নির্ভর। তাই প্রশাসনের কোলের সন্তান আমলাদের সাধারণভাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদে বসানো হয়। ব্যতিক্রম অল্পই। নির্বাচন ব্যবস্থা ঘিরেই মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি হয়। কেউ বড়ো হবে বলে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে তা অর্জন করেন। নিকৃষ্ট তারাই যাদের জোর করে তুলে ধরা হয়। দাঁড়কাকেরা নিজেদের কোকিল ভাবেন।

স্বপ্ন দেখেন এক চাকায় রথ চালাবেন। স্বার্থ চরিতার্থ করতে মানুষকে ঢাল বানান। পিঠ বাঁচাতে পরিবারকে বলি দিতে রাজি থাকেন। দুর্নীতি আর অন্যায়কে আড়াল করতে ফন্দিফিকির আঁটেন। আনুমানিক ৭৪ হাজার পঞ্চায়েত আসনে গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৪ হাজার আসনেই আসল লড়াই। গতবারের সংখ্যাটা ছিল ৪৮ হাজার। গায়ের জোরেই তৃণমূল জিতে নেয় প্রায় ৩৯ হাজার। বিজেপি পায় মাত্র ৬ হাজার আসন আর বাম ও কংগ্রেসের মোট আসন ৩ হাজার। আনুমানিক ৩৫ শতাংশ গ্রামের মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি তৃণমূল। অবশ্য আদালতে তা প্রমাণ হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। এই পেশিশক্তি প্রদর্শনের যুক্তি হিসেবে তারা পাশের রাজ্য ত্রিপুরা আর উত্তরপ্রদেশের উদাহরণ দিয়ে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ফারাক কেবল হিংসা আর সন্ত্রাসের যা এই রাজ্যের প্রশাসকের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূল মেনে নিয়েছে গা জোয়ারি করেই তারা পঞ্চায়েত নির্বাচন জিতবে। বাম জমানাতেও এই জোর খাটানো হতো। তখনকার বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, 'লাল সন্ত্রাস' আর 'সাইন্টিফিক রিগিং'। কোমরের রাজনৈতিক জোর কমে যাওয়ায় মমতা বিরোধী লড়াইয়ে এ রাজ্যের বাম ও কংগ্রেস এখন অনেকটাই বিজেপি আর তদন্ত এজেন্সি নির্ভর। গায়ের জোরে পঞ্চায়েত নির্বাচন জেতাটা তৃণমূলের কাছে বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে। না হলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লজ্জায় মুখ ঢাকতে হবে। রাজ্য দুর্নীতিতে মুড়ে গিয়েছে। এই দুর্নীতির যে কেবল কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চক্রান্ত তা বোঝানোর জন্য অভিষেকবাবু জনজোয়ার যাত্রা শুরু করেছেন।

তবে দুর্নীতি যে মাত্রায় পৌঁছেছে তাতে মানুষকে সহজে ভুল বোঝানো যাবে না। তৃণমূল দাবি করেছে ২৫ এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত তিনি চার হাজার কিলোমিটার পথ যাত্রা করেছেন। দুর্নীতি তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেছে। অভিযুক্ত না হয়েও তাঁর তিনবার জেরা হয়েছে। জেরা এড়াতে তিনি হন্যে হয়ে গিয়েছেন। আদালতের নির্দেশে চলা সরকারি তদন্তের কাজে বাধা দিচ্ছেন। কারণ তিনিও নাকি দুর্নীতির ভাগীদার। অনেকে তাঁর জনজোয়ার যাত্রাকে বলছেন 'চোরের মায়ের বড়ো গলা'। শোনা যাচ্ছে তিনি শীঘ্র গ্রেপ্তার বা আটক হতে পারেন। আর তা যদি হয় তাহলে পঞ্চায়েত ভোটের সাবেকি চিত্রটা বদলে যেতে বাধ্য। আধা সেনা দিয়ে ভোট হলেও এই গা জোয়ারির প্রথাগত চিত্র পালটে যাবে। নিদর্শন থেকে যাবে। ২০১৩ সালে নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডে সে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বাইরের শত্রু সিপিএম-কে হারিয়ে মমতা ক্ষমতায় এসেছিলেন।

মমতার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের তুলনায় অভিষেক রাজনৈতিক শিশু। আসলে অভিষেকবাবুর জনজোয়ার যাত্রা বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে নয়। ভিতরের শত্রুর বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য দলের নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতির পাশাপাশি নিজের দুর্নীতিকে আড়াল করা। মমতা কোনোদিন এই বিড়ম্বনার সম্মুখীন হননি। তাই চেনা শত্রুকে হারাতে পেরেছেন। তাঁর সমস্যা ছিল জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য নেতারা। তাই দল ভেঙেছিলেন। অভিষেকের সে সামর্থ্য বা ক্ষমতা নেই যে মমতার তৃণমূল ভেঙে নতুন তৃণমূল তৈরি করবেন। আর দুর্নীতি সরাবেন। তাই দুর্নীতির গড্ডলিকা প্রবাহে তিনিও গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। তাঁর খাজাঞ্চি জনৈক কালীঘাটের কাকু তার বড়ো প্রমাণ। নতুন তৃণমূলের সঙ্গে মমতার খুব একটা সখ্য নেই। স্নেহান্ধ মমতা খানিকটা বাধ্য হয়েই অভিষেকবাবুর রাজনৈতিক আবদার মেনে নিচ্ছেন। তাতে দাঁড়কাক কোনোভাবেই কোকিল হবে না। আর একচাকায় রথ চলবে না। ■

**স্নেহান্ধ মমতা খানিকটা বাধ্য হয়েই অভিষেকবাবুর রাজনৈতিক আবদার মেনে নিচ্ছেন। তাতে দাঁড়কাক কোনোভাবেই কোকিল হবে না। আর একচাকায় রথ চলবে না।**

# আগামী দেখাচ্ছেন মোদী দিদি কি দেখতে পাচ্ছেন ?

মোদীবিরোধীযু দিদি,

এই চিঠির শিরোনাম দেখে চটবেন না দিদি। ভাইকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন। তবে সদ্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের ৯ বছর পূর্তির পরে কয়েকটা বিষয় আমায় ভাবাচ্ছে। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি। যেটা প্রধানমন্ত্রী দেখাচ্ছেন। সবই যখন আপনার সঙ্গে শেয়ার করি তাই ভাবলাম আমার ভাবনাটাও আপনাকে জানিয়ে রাখি।

দিদি, বর্তমান নিয়েই সবাই ভাবে। সরকারও তাই, সাধারণ মানুষও তাই। কিন্তু বলা হয় বুদ্ধিমানরা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন। আর্থিক দিক থেকে তাঁরাই সুখে থাকেন যাঁরা আগামীর কথা আগাম ভাবেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাই। অতীত ও বর্তমানকে ভবিষ্যতের উপযোগী করে তোলাই বড়ো কাজ। এটা যাঁরা করেন তাঁরাই চিরকাল মাথা উঁচু করে থাকেন।

প্রথমেই দেখা যাক, রিজার্ভ ব্যাংকের শহুরে উপভোক্তাদের পছন্দ-অপছন্দ সংক্রান্ত 'ক্রেতা-আস্থা সূচক' কনজিউমার কনফিডেন্স ইনডেক্স বা সিসিআই) সমীক্ষা। তাতে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়দের আশাবাদী করে তুলতে দারুণ ভাবে সক্ষম হয়েছে মোদী সরকার। করোনাকালের পরে গোটা বিশ্বের আর্থিক পরিস্থিতি তলানিতে ঠেকলেও ভারত কিন্তু স্থিতিশীল। এই বর্তমানের উপরে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের সমীক্ষা বলছে, আগামী সম্পর্কে শহুরে মানুষের আশা যে হারে বাড়ছে, তা মোদী জমানোর আগে দেখা যায়নি।

দেশের অর্থনীতির হাল থেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ বা আয় বৃদ্ধি নিয়ে ক্রেতাদের আস্থা কোথায় আঘাত খেয়েছে আর কোথায় তা মজবুত, নিয়মিত সেই সমীক্ষা করে রিজার্ভ ব্যাংক। বলা হয়, সেই আস্থা যত মজবুত, ভোগ্যপণ্য কিনতে খরচের বিষয়ে তত বেশি স্বচ্ছন্দ হন ক্রেতা। আর চাকরি, আয়, এমনকী দেশের আর্থিক অবস্থার বিষয়ে আশঙ্কা যত বাড়ে, ততই খরচে হাত গোটানোর আশঙ্কা থাকে। শহুরে নাগরিকেরাই দেশের বাজারের ভোগ্যপণ্যের প্রধান ক্রেতা (কনজিউমার)। সেই কারণেই দেশের বিভিন্ন শহরের বাসিন্দাদের আস্থার (কনফিডেন্স) পরিমাপ করে নিয়মিত অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে আরবিআই।

দু'টি সূচকের উপর ভিত্তি করে এই মূল্যায়ন করে রিজার্ভ ব্যাংক। একটি 'বর্তমান পরিস্থিতি সূচক' (কারেন্ট সিচুয়েশন ইনডেক্স বা সিএসআই) এবং অপরটি 'ভবিষ্যতের প্রত্যাশা সুচক' ('ফিউচার এক্সপেকটেশন্স ইনডেক্স বা এফইআই)। ২০১৩ সালে (কংগ্রেস জমানার শেষ পর্বে) দুটি সূচক ছিল কাছাকাছি। সে বছরের সেপ্টেম্বরের 'বর্তমান পরিস্থিতি সূচক' ছিল ৮৮ এবং 'ভবিষ্যতের প্রত্যাশা সূচক' ৯০.৫। কিন্তু ডিসেম্বর থেকেই ব্যবধান বাড়তে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে। 'বর্তমান পরিস্থিতি সুচক' সামান্য বেড়ে ৯০.৭ হয়। কিন্তু 'ভবিষ্যতের প্রত্যাশা সূচক' একলাফে ১০ পয়েন্টের বেশি বেড়ে পৌঁছয় ১০০.৭-এ। ব্যবধান দাঁড়ায় ১০ পয়েন্টের।

অর্থাৎ বিজেপির তরফে 'প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী' হিসেবে মোদীর নাম উঠে আসতেই এমন বদল আসে। কারণ, মানুষের গুজরাট সরকার পরিচালনার ইতিহাস জানা ছিল। এরপর মার্চ এবং মে মাসে রিজার্ভ ব্যাংকের সমীক্ষায় 'বর্তমান পরিস্থিতি সূচক' এবং 'ভবিষ্যতের প্রত্যাশা সূচক'-এর ব্যবধান বেড়ে হয় যথাক্রমে ১৫ ও ২৫.২ পয়েন্ট। কিন্তু গত মে মাসে সমীক্ষায় ব্যবধান বেড়ে হয়েছে ২৭.৮ পয়েন্ট! ক্রেতাদের মধ্যে দেশের ভবিষ্যতে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া নিয়ে আশা বেশ উঁচুতে। বর্তমান পরিস্থিতি সূচক' এক সময়ে নেমে ১০০-র নীচে চলে গেলেও ২০১৯-এর গোড়াতে তা বেড়ে বেড়ে ১০৪ পয়েন্টে পৌঁছয়। অন্যদিকে, 'ভবিষ্যতের প্রত্যাশা সূচক' পৌঁছয় নজিরবিহীন ১৩৩.৪ পয়েন্টে। সে বছরের এপ্রিল-মে মাসের লোকসভা নির্বাচনে নজিরবিহীন জয় পায় বিজেপি। এখন আবার একটা লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসছে। আবার তা বাড়তে শুরু করেছে।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মোদীর আমলে 'ভবিষ্যতের প্রত্যাশা সূচক' সব সময়ই 'বর্তমান পরিস্থিতি সূচক'-এর থেকে এগিয়ে। অর্থাৎ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কোনও ব্যক্তি আর্থিক পরিস্থিতির যে হাল দেখছেন, এক বছর পরের পরিস্থিতি তার চেয়ে ভালো হবে বলে আশা করছেন। আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। কোভিড অতিমারির সময় যখন 'বর্তমান পরিস্থিতি সূচক' ৫০-এর নীচে নেমে গিয়েছিল, তখনও 'ভবিষ্যতের প্রত্যাশা সূচক' ১০০-র উপরে ছিল। ব্যবধান ছিল প্রায় ৬০ পয়েন্টের।

জীবনে নানা সমস্যা ও সংকট থাকা সত্ত্বেও ভারতের শহর ও শহর লাগোয়া জনপদগুলির বেশিরভাগ মানুষ ধরে নিয়েছেন যে তাঁদের বর্তমান অসুবিধাগুলি অস্থায়ী। সেটাই তাঁরা প্রমাণ করেছেন ক্রেতা-আস্থা সমীক্ষায়। কোভিড পরবর্তী পর্যায়ে ক্রেতা-আস্থা সংক্রান্ত দু'টি সূচকই আবার বেড়েছে। তবে ঊর্ধ্বমুখী গতি আগামী লোকসভা ভোটে বিজেপিকে জেতানোর মতো কি না, সে প্রশ্ন থাকছেই। যদি মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার উন্নতি হয়, তা হলে 'বর্তমান পরিস্থিতি সূচক' ২০১৯ সালের পরে আবার ১০০ পেরিয়ে যেতে পারে। যদি তা হয়, তার সুফল পেতে পারে দেশের শাসকদল।

না দিদি, এসব লিখলাম বলে জোট করে ঘোঁট পাকানোর চেষ্টা যেন ছাড়বেন না। দুর্নীতি থেকে বাঁচতে এবং ভাই-ভাইপোদের বাঁচাতে জোটই একমাত্র পথ দিদি। □

অতিথি কলম

বৈভব পুরন্দরে

# চলচ্চিত্র নির্মাতারা অতি দ্রুত ছক্কা মারতে গিয়ে ঐতিহাসিক সূত্রটি হারিয়ে ফেলছেন

ইতিহাসকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র নির্মাণ বিশেষ করে সেই ইতিহাস যদি নানা মত-অভিমতে বিভক্ত হয়, সেখানে সতর্কতা ও পর্যাপ্ত পূর্ব বিশ্লেষণ একটি আবশ্যিক শর্ত। আজ যা চলচ্চিত্রের পর্দাকে আকর্ষণীয় করে তুলছে তার মধ্যে সঞ্চিত থাকবে সেই হারানো অতীত যার বিকৃত উপস্থাপনা বর্তমান প্রজন্মকে প্রভাবিত করতেই পারে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অতীতে দেশকে আলোড়িত করা ঘটনাবলী যা ইতিহাসেরই আর এক নাম বিকৃত হতে হতে এক বকচ্ছপ চেহারা নিয়েছে। বাস্তবে 'খিলাফত আন্দোলন' কেন হয়েছিল আর সেক্ষেত্রে পরাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে আমাদের ভূমিকা কী ছিল তার সঠিক মূল্যায়ন কখনও হয়ে থাকলেও তার প্রভাব দেশীয় রাজনীতিতে সুখকর হয়েছিল কিনা বা ভবিষ্যতের জন্য কী রূপরেখা রচনা করেছিল তা দেশবাসী কিছুই জানে না। অথচ এটি একটি সুদূর প্রসারী নির্ণায়ক পদক্ষেপ ছিল।

এই ধরনের পটভূমিতেই বীর সাভারকরের ওপর অধুনা নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের ট্রেলার বাজারে ছাড়া হয়েছে যার প্রারম্ভিক লাইনটি হলো 'Gandhi was not a bad man'। কিন্তু এর পর দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে বলছে কিন্তু যদি তিনি অহিংস আন্দোলন নিয়ে অতটা না একগুঁয়ে হতেন তাহলে ভারত ৩৫ বছর আগেই স্বাধীন হয়ে যেত। অর্থাৎ স্বাধীনতার সালটা হতো ১৯১২। হায়! সেই সময় অর্থাৎ ১৯১২ সালে গান্ধী ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। আন্দোলনের পন্থাগুলি নিয়ে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯১৫ সালে। অন্যদিকে সাভারকর ছিলেন আন্দামানে। তিনি ১৯১১ সাল থেকে কালাপানি খাটছিলেন। তাঁর ৫০ বছরের অবিস্মরণীয় যাবজ্জীবন হয়েছিল। তৎকালীন পরাধীন ভারতের উচ্চতম নেতা বালগঙ্গাধর তিলক বার্মার মান্দালয় জেলে বন্দি ছিলেন। সর্বোপরি ভারতের জাতীয় অনুপ্রেরণার দিকটিকে ঘিরে ধরেছিল এক স্বাভাবিক হতাশা। এর কারণ ১৯০৭ সাল থেকে ইংরেজ দেশের অভ্যন্তরে দুটি ভয়ংকর জনবিরোধী আইন চালু করেছিল। একটি দেশবিরোধী 'জনসভা আইন' ও অন্যটি 'সংবাদ (প্রেস) সংক্রান্ত' আইন। কিন্তু এমন দুটি চরম জনবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক গণবিক্ষোভ সংগঠিত করার যোগ্যতম জননেতা 'লোকমান্য তিলক' তখন ব্রিটিশের রোষানলে দীর্ঘদিন জেলবন্দি। এই ঘটনাক্রম পর্যালোচনা করলে ভারতের পক্ষে ১৯৪৭ থেকে ৩৫ বছর আগে অর্থাৎ ১৯১২ সালে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার বিষয়টা অনেকটা আজগুলি লাগে না কি?

আলোচ্য ট্রেলরটিতে সাভারকর কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুকে যুগপৎ অনুপ্রাণিত করেছিলেন বলে যে তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে সেটিরও একটি তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা করা যেতে পারে। একথা নিশ্চিতভাবে সত্য যে লন্ডনস্থিত কিছু অকুতোভয় বিপ্লবী ভারতে গোপনে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপরেখা সংক্রান্ত চূড়ান্ত বিস্ফোরক লেখালিখি পাঠাতেন। এঁদের মধ্যে সাভারকর ছিলেন প্রধান। অবশ্যই এই ধরনের ইস্তাহার তৎকালীন বাঙ্গালি বিপ্লবীদের খুবই সাহায্য করত। কিন্তু তা সরাসরি ক্ষুদিরামের গোচরে আসত কিনা এমন কথা জানা যায় না। বাঙ্গলার নিজস্ব বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে সাভারকরের সঙ্গে এক সাক্ষাকারের ফলেই যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিদেশের মাটি থেকে এক বিপ্লব সংঘটিত করে ভারত আক্রমণ করার জন্য দেশ থেকে আত্মগোপন করে পালিয়ে ছিলেন এটিও বাক্যমূল্যে হয়তো সঠিক নয়। তিনি সাভারকরের সরাসরি পরামর্শে দেশ ছাড়েন এর অকাট্য প্রমাণ নেই। অবশ্যই সুভাষচন্দ্র সাভারকরের শিবাজী পার্কের বাড়িতে ১৯৪০ সালে দেখা করেছিলেন। কিন্তু সেই সাক্ষাৎকারের পর সুভাষচন্দ্র কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর মতামত ছিল নিজস্ব। কেননা এঁরা উভয়েই ছিলেন অবিস্মরণীয় দেশপ্রেমী।

এই ধরনের বিচিত্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে আলোচনার পরিধিতে রাখলে বোঝা যায় উল্লেখিত চলচ্চিত্রটি কোনো ব্যতিক্রম নয় এবং প্রথমও নয়। অধিকাংশ ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতারা তা যে ভাষারই হোক আদৌ নির্ভরযোগ্য নন যখন ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে তার চিত্ররূপ দেওয়া হয়। বিশেষ করে যদি জীবনী সংক্রান্ত ছবি হয়। তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তব্যটি হলো সৃষ্টির বা শিল্পীর স্বাধীনতা। কিন্তু এর মাঝখানে যেটি রয়ে যাচ্ছে সেটি মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া। চলচ্চিত্র, সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক বাক্য আছে 'wilfull suspension of disbelief'। অর্থাৎ অবিশ্বাস্য মনে হলেও সিনেমার খাতিরে সেই বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবকে কিছুক্ষণ দাবিয়ে রাখা। আমাদের সিনেমাওয়ালারা এই আপ্তবাক্যের সহায়তা নেন অত্যন্ত গর্বিত ভাবে। যার ফলে সাময়িক অবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁরা যুক্তিগ্রাহ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততাকে প্রায় ধ্বংস করে দেন।

আলোচ্য চলচ্চিত্রটি সাভারকরকে নিয়ে। যিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অনস্বীকার্যভাবে ছিলেন এক দুর্দমনীয় সাহসী ও বর্ণময় চরিত্র। স্বাভাবিকভাবে এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাঁর ওপর একটি যথার্থ জীবনী চিত্র নির্মিত হোক এটি জাতীয় দাবি। তিনি ছিলেন চরমপন্থী এবং তাঁর কার্যপদ্ধতি সর্বদা এক চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত। তাঁর জীবন ছিল দুর্যর্ষ নাটকীয়তায় ভরা, একই সঙ্গে চলত তুমুল বিতর্ক।

লন্ডনে কাটানো তাঁর বিপুল ঘটনাবহুল ৫ বছর। সেই সময়েই লন্ডনে এক প্রভাবশালী ইংরেজ অফিসারের হত্যা। এর পরই তাঁর আন্দামানে মোট কালাপানির ১০ বছর কাটানো— এমন চাঞ্চল্যকর সব ঘটনায় পূর্ণ।

এছাড়া তাঁর সমাজ সংস্কারের দীর্ঘ ব্রত। যেখানে তিনি হিন্দুদের ছোটো বড়ো তৎকালীন তীব্র জাতিপ্রথায় বিভক্ত সমাজকে একটি হিন্দু সমাজের বন্ধনে আনার যে প্রয়াস নিয়েছিলেন তাতে গোঁড়া উচ্চবর্ণীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। শেষমেশ গান্ধী মৃত্যুর পর তাঁকে চক্রান্তের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া। এত কিছু উত্তেজক ঘটনা থাকা সত্ত্বেও চলচ্চিত্রকারের নতুন করে মনগড়া চুটকির আমদানি করার কোনো প্রয়োজন ছিল কি? ২০০২ সালে রাজকুমার সন্তোষীর ভগত সিংহের ওপর ছবিটি একটি মানুষের জীবনের অবিশ্বাস্য নাট্যউপাদানে ভরপুর বিষয়কে সামনে এনে তাঁর অবদানকে গৌরবান্বিত করার সঙ্গে সঙ্গে ভারত ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে তোলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এই ধরনের বিস্ময়কর সব উপাদানে ঠাসা, যাকে বিষয় করে উপযুক্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যায়। অবশ্যই যদি নির্মাতারা সত্য কাহিনিটিকে তুলে ধরেন। এটি জাতীয় কর্তব্য পালনের স্থান পেতে পারে।

শুধু সাভারকরের জীবনটি ধরলেই দেখা যাবে তিনি মদনলাল ধিংড়া, ভিভিএস আয়ার, অনন্ত কানহেরের মতো বিপ্লবী ছাড়াও এক সম্পূর্ণ বিপ্লবী প্রজন্মের কাছে অনুসরণীয় বীর হয়ে উঠেছিলেন। এদের মধ্যে বাঙ্গলার বিপ্লবীদের অনেকেই ছিলেন, যেমন উল্লাসকর দত্ত বা পঞ্জাবের 'গদর পার্টি'র বিপ্লবীরা, একই সঙ্গে গান্ধীবাদী অরুণা আসফ আলি যিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা করতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

এরপর ১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহ যাকে সাভারকর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের আখ্যা দিয়েছিলেন সেই বই পড়ে বহু বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। তাই সাভারকরকে কেন গান্ধী-নেহরু-বোস চক্রের মধ্যে টেনে আনতে হবে? যেখানে তাঁর নিজের জীবনকর্মটিই সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তুমুল উপাদানে ভরা।

এখানে শুধুমাত্র চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ভূমিকা ছাড়াও রাজনীতি ক্ষেত্রের সর্বস্তরেও ইতিহাস অস্বচ্ছভাবে আলোচিত হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিকৃত হয়। এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ সমগ্র স্বাধীনতা সংগ্রামে সাভারকরের ভূমিকাকে নিন্দা করছেন। তাঁর অবদানকে খাটো করে দিচ্ছেন এই যুক্তি দিয়ে যে তিনি হিন্দুত্ব প্রচার করেছিলেন, স্বঘোষিত নেতাজী কন্যা অনীতা পাফ আরও নীচে নেমে গিয়ে বলছেন সুভাষচন্দ্র ও সাভারকরের মধ্যে একটিই মিল ছিল যে তাঁরা দু'জনেই হিন্দু ছিলেন। সত্যিই কি তাই? দু'জনের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে অমিল থাকলেও সুভাষচন্দ্রের সাভারকরের প্রতি বিপ্লবী হিসেবে সম্মান ছিল অগাধ।

১৯৩৭ সালে যখন তিনি জেল হেফাজত থেকে মুক্তি পান, সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন আমার মনে হয় এমন কোনো ভারতীয় নিশ্চয় নেই যারা আজ সুখী বোধ করবে না যখন জানবে যে সর্বত্যাগী সাভারকর আজ মুক্ত মানুষ। জিন্না ও আম্বেদকরও সাভারকরকে রাজনৈতিকভাবে সমগোত্রীয় ভাবতেন। সেই কারণে আজ অনীতা পাফের কথা মূল্যহীন। যেমন মূল্যহীন কমিউনিস্টদের মূল্যায়ন। এমন বর্ণময় একটি মানুষের জীবনভিত্তিক চলচ্চিত্রায়নে তাই অতিরঞ্জন অনভিপ্রেত।

*(লেখক টাইমস অব ইন্ডিয়ার সিনিয়র এডিটর এবং বীর সাভারকরের জীবনীলেখক)*

## শোকসংবাদ

কেশপুর থানার শুকনাস শাখার স্বয়ংসেবক তথা খণ্ড শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ টুটুল দলবেরার পিতৃদেব পঞ্চানন দলবেরা গত ১১ জুন পরলোকগমন করেন।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, গত জন্মাষ্টমী '২২ থেকে স্বস্তিকার ৭৫ বছর পালনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অবসরে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। এটি আগামী অক্টোবর '২৩-এ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা (অর্থাৎ ১৫ আগস্ট, ২০২৩ -এর মধ্যে যাঁরা সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে কপি বুক করবেন তাদের জন্য)।

১৫ জুন, ২০২৩ থেকে অনলাইনে ওই টাকা পাঠানো যাবে। অনলাইনে টাকা পাঠালে নিচের দেওয়া ফোন নম্বরে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। জেলা অনুসারে তালিকা-সহ টাকা জমা করতে পারেন।

যোগাযোগ—

**শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১**

**শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯২৯৭**

***অনলাইনে টাকা পাঠানোর Bank Details—***

Name - Swastik Prakashan Trust
Bank - Punjab National Bank
Branch- Vivekanand Road, Kolkata-700006
A/c. No. - 0954000100121397
IFS Code - PUNB0095400

*বিঃ দ্রঃ*— নগদ টাকা স্বস্তিকা দপ্তরেই জমা দিতে হবে।
চেক দিলে Swastik Prakashan Trust—এই নামে চেক কাটতে হবে।

# উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে গোপাচার

আগামীদিনে ভারত - বাংলাদেশ - মায়ানমারের সীমান্ত এলাকা গোরু পাচারের স্বর্গরাজ্য হতে যাচ্ছে, এরকম আশঙ্কা অমূলক নয়। অতি সম্প্রতি অসম পুলিশের হাতে চৌদ্দটি পাচার হতে চলা গোরু ও দু'জন পাচারকারী বমাল গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই আশঙ্কা আরও জোরালো হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া দুই ব্যক্তির নাম মুজিবুর রহমান বরভুঁইয়া ও জিয়াউল রহমান। এরা দুজনেই ত্রিপুরার উত্তরাংশের বাসিন্দা। মুজিবুর থাকেন পাঁচগুড়ি বালিছেঁড়া গ্রামে, অন্যদিকে জিয়াউল কুমড়াখাউরি গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, তারা মায়ানমার থেকে অসমের হাইলাকান্দিতে গোরু পাচার করছিল। সূত্র মারফত খবর পেয়ে বিলাইপুর থানার পুলিশ নুনাই এলাকা থেকে ৯ জুন রাতে এই দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে এবং চৌদ্দটি গোরু উদ্ধার করে।

অনুমান করা হচ্ছে, গোরু পাচারকারীরা ভারত-বাংলাদেশ মায়ানমারের সীমান্ত বরাবর তাদের সেফ জোন খুঁজে নিতে চাইছে। কিছুদিন আগেই গোয়েন্দাদের কাছে রিপোর্ট এসেছিল যে, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ডিভিশনের কক্সবাজার সীমান্তবর্তী উপজেলার নাইখংছড়ি সীমান্ত এলাকা অরক্ষিত থাকায় মায়ানমার থেকে অলিকদম ও নাইখংছড়ি উপজেলা দিয়ে প্রতিদিন প্রবেশ করছে শত শত গোরু-মহিষ ইত্যাদি গবাদি পশু। দুই উপজেলায় এই পাচারচক্র গড়ে গত এক বছরে অঢেল টাকার মালিক হয়েছেন বহু মানুষ। অভিযোগ, এই চক্র এতটাই শক্তিশালী যে, তারা বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিজিবির ওপরও হামলা চালাতে পিছপা হয়নি। এমনই এক ঘটনায় গত ১০ এপ্রিল আড়াইশো জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে চট্টগ্রাম ডিভিসনের নাইখংছড়ি সীমান্তের বিজিবি।

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, দেশীয় খামারের গোরু বলে মায়ানমার থেকে আনা অবৈধ জাল দলিল তৈরি করে তা বৈধ দেখিয়ে গোরু পাচার করা হচ্ছে। প্রতিটি গোরু মায়ানমার থেকে ৬০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকায় কিনে তা বিক্রি করা হয় ১ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায়। মাঝে মধ্যে মালিক বিহীন গোরু আটক হলেও চোরাকারবারিরা রয়ে যায় অধরা। এই অবস্থায় সীমান্তে গোরু ও মাদকপাচার নিয়ে তথ্যাভিজ্ঞ মহলে যথেষ্টই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সরেজমিনে নাইখংছড়ি উপজেলার চাকঢালা, আশারতলি, কম্বনিয়া, জারুলিয়াছড়ি, ফুলতলি এলাকার স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানিয়েছে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মদতে নাইখংছড়ি সীমান্তে অন্তত শতাধিক মানুষ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। কেউ সীমান্ত পাহারা, আবার কেউ-বা চোরাই গোরু গন্তব্যে পৌঁছানোর কাজ করে। ইতিপূর্বে সীমান্তের ওপার থেকে প্রতিদিন গোরু আনা হলেও বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ সপ্তাহে দুদিন মোটামুটি সোম ও বৃহস্পতিবার গোরু নিয়ে আসছে চোরাকারবারিরা। স্থানীয়দের বক্তব্য—সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে আনা গোরু প্রথমে গ্রামের বিভিন্ন খামরে মজুত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় গর্জনিয়া বাজারে এনে ইজারাদারের কাছ থেকে রশিদ সংগ্রহ করে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হয়। গোরু নিয়ে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড, বিজিবির সঙ্গে চোরাকারবারিদের সংঘর্ষে প্রাণহানি-সহ নানা অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে এ দুটি উপজেলার মানুষরা চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

গত ফেব্রুয়ারিতে চট্টগ্রামের বান্দরবনের অলিকদম উপজেলার দুর্গম কুরুকপাতা ইউনিয়নের মাতামুহুরী নদী সংলগ্ন রোয়াম্বু ঝিরি নামকস্থানে অভিযান পরিচালনা করে মায়ানমার থেকে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে চোরাইভাবে নিয়ে আসা ৩৭টি গোরু আটক করে বিজিবি। গোপনসূত্রে সংবাদ পেয়ে এ বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি সকালে অলিকদম ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল বাসিতের নেতৃত্বে ২০ জন বিজিবি সদস্য এবং ২ জন পুলিশ সদস্যের যৌথ একটি টিমের অভিযানে গোরুগুলো উদ্ধার হয়। তবে এ সময় কোনো চোরাকারবারিকে আটক করা যায়নি।

বাংলাদেশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, চোরাই এই গোরু চোরাচালানের সঙ্গে নাইখংছড়ির একজন চেয়ারম্যান-সহ বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জড়িয়ে আছেন। যার কারণে এসব জনপ্রতিনিধিদের ভয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা গোরুপাচার প্রতিরোধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন না।

বিশেষ করে নাইখংছড়ি সীমান্তের পাঁচটি স্থানে গোরু পাচার হয়ে থাকে। অভিযোগ যে, এসব চক্রের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো চক্রের নেতৃত্বে রয়েছেন রামুর কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৭নং ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি জসিমউদ্দিন এবং ৪নং ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি অন্য জসিমউদ্দিন। অপরদিকে নাইখংছড়ি সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নুরুল আবসার ইমন, উপজেলা যুবলিগ সাধারণ সম্পাদক আলি হোসেনও এই গোরুর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে এলাকায় প্রচার রয়েছে।

বাংলাদেশ-মায়ানমার এই গোরুপাচার উদ্বেগ এবার হাইলাকান্দির ঘটনায় ভারতেও এসে পড়লো। গোরুপাচার যে সমান্তরাল অর্থনীতি, তা অবৈধ হলেও, যে নিয়ন্ত্রণ করে তা প্রমাণিত। তাই এতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও যুক্ত হয়ে পড়েন, বাংলাদেশে এই ঘটনা দেখা গিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গেও তা প্রমাণিত। তাই পাচারকারীরা প্রভাবশালী হওয়ার জন্য পুলিশ-প্রশাসনও নিশ্চুপ থাকে। এই প্রবণতাই ভারত ও তার পড়শি দেশগুলিতে উদ্বেগ ছড়াচ্ছে। □

# ঈশ্বরের নিজের দেশে অধর্মের পাহাড়

**সুদীপনারায়ণ ঘোষ**

২০২০ কেরালার সোনা চোরাচালান মামলায় আলোচনায় উঠে আসে স্বপ্না সুরেশ নামে এক আইটি পেশাদারের নাম। সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস ২০২০-র ৫ জুলাই স্বপ্না সুরেশ এবং তার সঙ্গীদের কাছ থেকে ১৪.৮২ কোটি টাকা মূল্যের ২৪-ক্যারেটের ৩০ কিলোগ্রাম (৬৬ পাউন্ড) সোনা বাজেয়াপ্ত করে। তিনি আবুধাবি বিমানবন্দরে যাত্রীসেবা বিভাগে কাজ শুরু করেছিলেন। কিছুদিন পর দেশে ফিরে তিরুবনন্তপুরমে এক ট্রাভেল এজেন্সিতে দু'বছর কাজ করেন। ২০১৩-এ তিনি মানবসম্পদ নির্বাহী পদে এয়ার ইন্ডিয়া স্যাট কাজ শুরু করেন। কোম্পানিতে থাকাকালীন স্বপ্না সুরেশ ১৭ জন মহিলা সহকর্মীর সই জাল করে সংস্থার কয়েকজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভের সহায়তায় এক পুরুষ সহকর্মীর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির মামলা করেন। শীঘ্রই এই কর্মী স্বপ্না সুরেশের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে এবং প্রভাব খাটিয়ে তদন্ত বন্ধ করে দেয়।

তিনি ২০১৬ সালে কেরালা রাজ্যস্থিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের কনস্যুলেটে কনসুলেট জেনারেলের সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান করেন। একজন কূটনীতিকের পরিচয় ভাঙিয়ে সামাজিক, আমলাতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক উচ্চ মহলে দহরমমহরম তৈরি করেন। একই অফিস থেকে এক বছর আগে কোনো এক ফৌজদারি মামলায় তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। পরে মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের খুব ঘনিষ্ঠ একজন সিনিয়র আইএএস অফিসার ও কেরালার তথ্যপ্রযুক্তি সচিব এম শিবশঙ্কর স্বপ্না সুরেশকে কেরালা স্টেট ইনফরমেশন টেকনোলজি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড (কেএসআইটিআইএল)-এর কাছে সুপারিশ করেছিলেন এবং তাকে সংস্থায় মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিসেবে নিয়োগ করিয়েছিলেন।

তদন্তে প্রকাশ, এরপর এম শিবশঙ্কর তাকে জাল শিক্ষাগত নথি দিয়ে প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপার্সে অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ পাইয়ে দিয়েছিলেন। অল্পদিন পরেই এর জন্য প্রাইস ওয়াটারাহাউস কুপার্সের বিরুদ্ধে কেএসআইটিআইএল পুলিশি তদন্ত শুরু করে। কেএসআইটিআইএল আধিকারিকরা জানান, স্বপ্না সুরেশ একজন স্নাতক হিসাবে চাকরির জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু পরে জানা গেছে তার বিদেশস্থিত ভাই মিডিয়াকে বলেছে যে তিনি রাজ্য স্কুল বোর্ডের পরীক্ষাও শেষ করেননি। একটি ট্র্যাভেল এজেন্সিতে তার একজন প্রাক্তন সহকর্মীও তার যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে তিনি কেবল দ্বাদশ শ্রেণী শেষ করেছেন।' এহেন যোগ্যতার একজন কীভাবে রাজ্যক্ষমতার শীর্ষস্তরের ব্যক্তিত্বদের আনুকূল্য লাভ করে? তিনি অতি সুন্দরী ছিলেন! তদন্তে প্রকাশ যে ভাদাকাঞ্চেরিতে এক অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ প্রকল্পে তার কিছু আর্থিক কেলেঙ্কারিও ধরা পড়েছিল। স্বপ্না সুরেশকে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ২০২০-কেরালা সোনা চোরাচালান মামলায় অভিযুক্ত করেছিল। তার সঙ্গে ছিল সারিথ কুমার, ফাজিল ফরিদ, সন্দীপ নায়ার, এন. শিবশঙ্কর এবং রাশেদ খামিস আলি মুসাইক্রি আলশেমেলি। স্বপ্না সুরেশের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে এম শিবশঙ্করকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এই আলশেমেলি সংযুক্ত আরব আমিরাতের নাগরিক। এনআইএ তাকে তদন্ত করার আগেই পিনারাই বিজয়ন সরকার তাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

২০২০-র ৫ অক্টোবর স্বপ্না সুরেশকে জামিন দেওয়া হয়। ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট টিভি সাংবাদিক ও জনম টিভির সমন্বয়কারী সম্পাদক অনিল নাম্বিয়ারের বিরুদ্ধে ২০২০-কেরালার সোনা চোরাচালান মামলায় তদন্ত করেছিল, কারণ যখন ২০২০-র ৫ জুলাই কাস্টমস চোরাচালান করা সোনা বাজেয়াপ্ত করেছিল তখন তিনি স্বপ্না সুরেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। উপরন্তু ২০২২ সালের জুনে প্রাক্তন মন্ত্রী কেটি জলিল তার বিরুদ্ধে এক নতুন ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করেছেন।

স্বপ্না সুরেশের এইসব ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আমরা বিন্দুমাত্র ভাবিত নই। কিন্তু ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করেছে যখন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন-সহ সিপিআইএমের বড়ো বড়ো নেতাদের নাম অবধারিতভাবে এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে। সেই জন্যই স্বপ্না সুরেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কীর্তিকলাপের এই নান্দীমুখ আবশ্যক বোধ হলো। এইবার আমরা আসল বিষয়ে যাব।

**যে সিপিআইএম সততার কথা পাড়ে এবং তাদের রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রতিপক্ষকে সর্বদা সততা, নৈতিকতার দোষ দিয়ে কলঙ্কলিপ্ত করে, যাদের দৃষ্টিভঙ্গী 'হোলিয়ার দ্যান দাউ' (আমরা তোমাদের থেকে পবিত্রতর), এখন তারা নিজেরাই কালিমালিপ্ত। কেরালায় তারা কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে ব্যস্ত আর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সহযোগী।**

গত ৯ মার্চ, ২০২৩ স্বপ্না অভিযোগ করেছেন যে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের নাম মামলা থেকে বাদ দেওয়ার বিনিময়ে তাকে ৩০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ফেসবুকে স্বপ্না জোর দিয়েছেন যে তাকে মুখ্যমন্ত্রী দেশ ছাড়ার হুমকি দিয়েছেন। তিনি সিপিএম সম্পাদক গোবিন্দন মাস্টারের কাছ থেকে প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন বলেও অভিযোগ করেছেন। স্বপ্না বলেছেন, 'আমি বিজয় পিল্লাই নামে একজনের কাছ থেকে একটি বেনামি ফোন পেয়েছি। তিনি রফা করার কথা বলতে এসেছিলেন। তিনি আমাকে বেঙ্গালুরু ছেড়ে যেতে বললেন। সিপিএম পার্টির সেক্রেটারি গোবিন্দন মাস্টার পিল্লাইকে বলেছিলেন আমাকে হুমকি

ফ ঃ ২

দিয়ে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বলতে। তারা আমাকে পিনারাই বিজয়ন, তার মেয়ে ও ব্যবসায়ী ইউসুফ আলি সম্পর্কে কথা বলা বন্ধ করতে বলে। তারা আমাকে ৩০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল'। স্বপ্না সুরেশ আরও বলেছেন, 'তারা চায় আমি হরিয়ানা বা জয়পুরে যাই। ফ্ল্যাট-সহ সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে বলে জানান তারা। জাল পাসপোর্ট তৈরি হয়ে গেলে তারা আমার দেশ ছাড়ার ব্যবস্থা করবে। বিজয় পিল্লাই আমাকে হুমকি দিয়েছিল এবং দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল। সিএম পিনারাই বিজয়ন বা তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই বা তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ধ্বংস করতে চাই না। আমাকে স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে সিপিএম সম্পাদক গোবিন্দন মাস্টার আমার জীবন শেষ করবেন। এই ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে তিনি আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে ২ দিন সময় দেবেন। আমি আমার আইনজীবীকে তার ফোন নম্বর ও ইমেল ঠিকানা পাঠিয়েছি। আমি ওই ব্যক্তির ছবি মিডিয়াকে দেব। আমি বেঙ্গালুরু থেকে পালিয়ে যাব না। দয়া করে আমার জীবনের জন্য প্রার্থনা করুন'।

স্বপ্না সুরেশ সিএম পিনারাই বিজয়নের 'পুরো ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য' ফাঁস করার হুমকি দিয়ে বলেছেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই আমি শেষ অবধি লড়াই করতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে এমন লোক আছে যারা আমাকে বিশ্বাস করে। আমি বেঁচে থাকলে আপনার পুরো ব্যবসা সাম্রাজ্যকে ফাঁস করব এবং আমাকে হুমকি দেওয়ার সাহস করবেন না বা কখনও ভাববেনও না। আমি আপনার আসল চেহারা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরবো।'

সোনা চোরাচালান মামলায় স্বপ্না সুরেশ মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এবং অন্য তিন মন্ত্রীর নাম দিয়েছেন। এর আগে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে স্বপ্না সুরেশ সোনা চোরাচালান মামলায় মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, তার পরিবার এবং তার মন্ত্রীসভার তিনজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছেন।

গত বছর আদালতে তার জবানবন্দি দেওয়ার পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে স্বপ্না অভিযোগ করেছিলেন যে ২০১৬ সালে সিএম বিজয়ন যখন দুবাইতে ছিলেন তখন টাকা-সহ একটি ব্যাগ পাঠানো হয়েছিল। স্বপ্না সুরেশ যোগ করেছেন যে কনস্যুলেটের প্রোটোকল হিসাব লাগেজ স্ক্যান করার পরে সেই অর্থ শনাক্ত করা হয়েছিল। তবে ব্যাগে কোন দেশের মুদ্রা ছিল তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন তিনি।

তিনি আরও বলেছিলেন যে এন শিবশঙ্কররের নির্দেশে ভারী ধাতুর বিরিয়ানি পাত্রগুলি কনস্যুলেট জেনারেলের বাড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ক্লিফ হাউসে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি যোগ করেছেন 'এই পাত্রে বিরিয়ানি নয়, অন্য ভারী জিনিস ছিল। আমি এখনই সবকিছু প্রকাশ করতে পারছি না। সঠিক সময় হলে আমি আরও প্রকাশ করব'। ২০২১-এ কেরালার বিধানসভা নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) সরকার কঠিন অবস্থায় পড়েছিল যখন স্বপ্না সুরেশ কাস্টমস বিভাগকে জানিয়েছিলেন যে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন সোনা ও ডলার চোরাচালানের মামলার ঘটনায় জড়িত ছিলেন।

২০১৯ সালে একজন মহিলা মুম্বাইয়ের ওশিওয়ারা পুলিশের কাছে বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য প্রবীণ সিপিআইএম নেতা ও সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোডিয়ারি বালাকৃষ্ণনের ছেলে বিনয় কেতাডিয়ারির বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এনে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। বিহারের বাসিন্দা ওই মহিলা দাবি করেছেন যে তাদের সহবাসের ফলে তার একটি ৮ বছর বয়সি সন্তান রয়েছে এবং তার ছেলেকে বড়ো করার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। বিনয় তার বিরুদ্ধে দায়ের করা যৌন নির্যাতনের মামলায় ৮০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করেছে। মীমাংসার শর্ত মেনে নিয়ে মুম্বাই হাইকোর্ট এফআইআর বাতিল করেছে।

উভয় পক্ষই মহিলার গর্ভে জন্ম নেওয়া শিশুটিকে লালনপালনের জন্য ক্ষতিপূরণের বিষয়ে পারস্পরিকভাবে সম্মত হয়েছে। আদালতে জমা দেওয়া নথি অনুসারে তাকে ইতিমধ্যেই অর্থ প্রদান করা হয়েছে। তবে নথিতে সন্তানের পিতৃত্ব সম্পর্কে তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিনয় পরে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে দাবি করেন যে তাকে মহিলা মিথ্যাভাবে ফাঁসিয়েছে। আদালত ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দেয়। আদালতের বাইরে মামলা নিষ্পত্তির পদক্ষেপ শুরু হলে ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের জন্য আদালতের কাছে আবেদন করেন ওই মহিলা। সিপিআই (এম) নেতা কোডিয়েরি বালাকৃষ্ণনের ছেলে বিনীশ মাদক মামলায় বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রিমান্ডে রোজিয়েরি বালাকৃষ্ণনের কনিষ্ঠ পুত্র বিনীশ কোডিয়েরিকে মাদকের মামলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি) চার দিনের জিজ্ঞাসাবাদের পর ২০ নভেম্বর, ২০২০ একটি আদালত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রিমান্ডে পাঠিয়েছে। চার দিনের এনসিবি হেফাজত শেষ হওয়ার পরে বিশেষ এনডিপিএস আদালত রিমান্ডের আদেশ দেয়।

বিনেশকে ২৯ অক্টোবর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এখানে মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার করেছিল। ইডি মামলায় বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকাকালীন ১৭ নভেম্বর এনসিবি তাকে গ্রেপ্তার করে। ব্যুরো মাদক পাচার নেটওয়ার্কের সঙ্গে তার যোগসূত্র খুঁজে বের করার জন্য তাকে হেফাজতে চেয়েছিল, কারণ সে মাদক ব্যবসায়ী মহম্মদ অনুপের ঘনিষ্ঠ ছিল এবং তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সে ৫০ লক্ষ টাকার বেশি স্থানান্তর করেছিল।

অনুপের নামে বেনামি হোটেল চালানোর জন্য বিনীশকেও অভিযুক্ত করেছে ইডি। এনসিবি আগস্টে অনিখা ডি এবং রিজেশ রবীন্দ্রনের সঙ্গে অনুপকে সিন্থেটিক ড্রাগ রাখার জন্য গ্রেপ্তার করেছিল, তারা ব্যাঙ্গালোর শহরে কন্নড় চলচ্চিত্র অভিনেতা ও গায়কদের ওই ড্রাগ সরবরাহ করেছিল বলে অভিযোগ। কোডিয়েরি বালাকৃষ্ণন তার ছেলের গ্রেপ্তারের পরেই স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে কেরালায় সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। আসলে তাকে সিপিআইএম দল অস্বস্তির কারণে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে সরিয়ে দেয়। এই বালাকৃষ্ণান তার ক্যাডারদের বাঁচাতে দরকারে পুলিশ থানায় বোমা তৈরিতে অনুমোদন দেবেন বলেছিলেন। তিনি তাঁর দুই ছেলেকে কেরালা পুলিশ যখন প্রিজন ভ্যানে করে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের জোর করে নামিয়ে দেন।

এইসব ঘটনার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর যোগ ছিল বা এখনো আছে এবং এই অবৈধ টাকার ভাগ সন্ত্রাসীদের হাতে যায়। যে সিপিআইএম সততার কথা পাড়ে এবং তাদের রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রতিপক্ষকে সর্বদা সততা, নৈতিকতার দোষ দিয়ে কলঙ্কলিপ্ত করে, যাদের দৃষ্টিভঙ্গী 'হোলিয়ার দ্যান দাউ' (আমরা তোমাদের থেকে পবিত্রতর), এখন তারা নিজেরাই কালিমালিপ্ত। কেরালায় তারা কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে ব্যস্ত আর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সহযোগী। □

# ভারতের অর্থনীতি পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর লক্ষ্য কতটা বাস্তবসম্মত

**ড. রতন কুমার ঘোষাল**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের অর্থনীতিকে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের (অর্থাৎ পাঁচের ডানদিকে ১২টি শূন্য যোগ করলে যা হয়) অর্থনীতিতে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন অর্থাৎ ভারতের মোট প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন ২০২৪-২৫ সালে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর লক্ষ্য। এখন প্রশ্ন হলো, প্রধানমন্ত্রীর এই লক্ষ্য কি খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষামূলক? অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো আমি বলব, আদৌ না। যদি বলা হয় ভারতের অর্থনীতি বর্তমান গতিপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এটা কি বাস্তবসম্মত? উত্তর অবশ্যই হ্যাঁ। কিন্তু কেন বা কীভাবে? এই প্রশ্নগুলির উত্তরই এই প্রবন্ধে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমার বেশ মনে পড়ে, সম্ভবত যখন আমি গ্রামের স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমাদের সংস্কৃতের মাস্টারমশায় 'সূক্তিরত্নাবলী' নামে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পড়িয়েছিলেন। তার মধ্যে একটা শ্লোক ছিল--- 'উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি, কার্যানি ন মনোরথৈঃ।/ ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।। অর্থাৎ উদ্যম বা প্রচেষ্টার দ্বারাই কোনো কাজ সফল হয়, কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারাই নয়। যেমন ঘুমন্ত সিংহের মুখে আপনা হতে শিকার প্রবেশ করে না। আমরা আমাদের ভারতবর্ষে যে অত্যন্ত উদ্যমী, অদম্যদৃঢ়চেতা, সততা সম্পন্ন, দক্ষ ও নিপুণ প্রধানমন্ত্রীকে পেয়েছি এবং তিনি ভারতকে সামগ্রিকভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত কৌশল নিয়ে চলেছেন, তাতে ভারত ওই লক্ষ্যে অবশ্যই পৌঁছাবে। সময় হয়তো আর একটা আর্থিকবর্ষ বেশি লাগতে পারে। একটু অন্য ভাবে বলা যায় যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দক্ষ চালক দ্বারা চালিত হয়ে যে ইঞ্জিন তার ৩২টা বগিকে (সমস্ত রাজ্য ও অঙ্গরাজ্যগুলি) টেনে নিয়ে চলেছে তাতে মনে হয় ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের লক্ষমাত্রা অবাস্তব নয়। তবে বগিগুলির অভ্যন্তরীণ কাঠামো দৃঢ় ও শক্তপোক্ত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ রাজ্যসরকারগুলিকেও দেশমাতৃকাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। যাতে ভারত আবার জগৎসভায় সার্বিকভাবে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে ও আত্মনির্ভর উন্নততম দেশে পরিণত হয়। স্বামীজী এটাই চেয়েছিলেন। তিনিও উদ্যম, দক্ষতা, কৃৎকৌশলের উন্নতি ও দেশীয় সম্পদের পূর্ণব্যবহারের মাধ্যমে ভারতবাসীকে আত্মনির্ভর করে তুলতেই চেয়েছিলেন। এমনকী তিনি পশ্চিমি দেশের কৃৎকৌশলকে ভারতের মতো দেশের উপযোগী করে নিয়ে কৃষি ও শিল্পে কাজে লাগিয়ে এবং লিঙ্গ, জাতপাত নির্বিশেষে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার দ্রুত বিকাশ ঘটিয়ে ভারতকে উন্নত আত্মনির্ভর দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন ও তা বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্যোগও নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, আমরা এমন একটি রাজ্যে বাস করছি যার অর্থনৈতিক কাঠামোর অবস্থা শোচনীয় এবং পুরো শিক্ষা ও অর্থব্যবস্থা দুর্নীতির শীর্ষে পৌঁছে গেছে। আসলে রাজ্যের বর্তমান শাসকদল এই রাজ্যে একটা নিম্নমানের ভারসাম্যের ব্যবস্থা জিইয়ে রাখতে চায়।

আমি কীসের ভিত্তিতে বলছি যে ওই লক্ষ্যে পৌঁছানো অবশ্যই সম্ভব। ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত কার্যকরী দলের মতে ভারতকে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে হলে কৃষি ও সহকারী ক্ষেত্রের জিডিপি এক ট্রিলিয়ন ডলারে, শিল্পক্ষেত্রের জিডিপি এক ট্রিলিয়ন ডলারে ও সেবাক্ষেত্রের জিডিপিতে তিন ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে হবে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতকে

৫ ট্রিলিয়ন ডলারের জিডিপি-তে পৌঁছতে ২০২৭-২৮ সাল হবে। তার জন্য যা দরকার তা হলো : (১) ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদনকে (জিডিপি) গড়ে বছরে ৬.৫ শতাংশ হারে বাড়তে হবে, (২) আমেরিকাতে মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পেতে হবে, যা বর্তমানে ৪.৭ শতাংশ।

এখন আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতির হারের সঙ্গে ভারতের ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছানোর সম্পর্কটা কী তা একটু বলা দরকার। ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব বলে অর্থনীতিতে একটা ধারণা আছে। এটা বিভিন্ন দেশের দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ দামের ভিত্তিতে বিচার করা হয়। ধরা যাক ভারতে এক কিলোগ্রাম গমের দাম হলো দশ টাকা ও আমেরিকাতে তাহলো এক ডলার। তাহলে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার মুদ্রা বিনিময় হবে ১ ডলার = ১০ টাকা। অর্থাৎ আমেরিকা থেকে ১ ডলার কিনতে হলে ভারতের কোনো ব্যক্তিকে ১০ টাকা দিতে হবে। বা ভারত থেকে ১০ টাকা নিতে হলে আমেরিকার লোককে ১ ডলার দিতে হবে। এখন যদি আমেরিকাতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে গমের দাম বেড়ে (১ কেজির) দাম ২ ডলার হয় অথচ ভারতে গমের দাম কিলোপ্রতি ১০ টাকায় থাকে তাহলে ভারতের লোক এখন ১০ টাকার বিনিময়ে ২ ডলার পাবে। অর্থাৎ ভারতে টাকার দাম ডলারের সাপেক্ষে বাড়লো এবং পক্ষান্তরে আমেরিকার ডলারের দাম কমল।

অর্থাৎ টাকা-ডলারের বিনিময়ের হার হলো ১ :২ যা আগে ছিল ১ : ১। এখন যেহেতু ভারতের অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা ৫ ট্রিলিয়ন ডলার, সেজন্য আমেরিকাতে যত মুদ্রাস্ফীতি হবে, ভারতের পক্ষে তত শীঘ্র ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছানো সহজ হবে।

**সার্বিকভাবে আমাদের মোট প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন ও তার ক্ষেত্রেগুলি উৎপাদন বৃদ্ধির হারের গতি প্রকৃতি, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চালিকা শক্তিগুলির গতিপ্রকৃতি এবং ওই সংক্রান্ত গৃহীত নীতিগুলি সর্বোপরি ভারত সরকার কর্তৃক বর্তমানে গৃহীত নীতি ও প্রকল্পগুলি; এবং আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় যথা গত আর্থিক বছরে (২০২২-২৩) জিডিপি বৃদ্ধির হার ৯.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, এগুলির ভিত্তিতে অবশ্যই বলা যেতে পারে যে ভারতের অর্থনীতির ৫ ট্রিলিয়ন জিডিপি-র অর্থনীতিতে পৌঁছানোর লক্ষ্য বাস্তবসম্মত ও অধরা নয়।**

এখন ওই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর সম্পর্কে ধারণার জন্য সবচেয়ে সহজ মাপকাঠি হলো ভারতের মোট প্রকৃত জাতীয় উৎপাদনের (রিয়েল জিডিপি) (অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হারের দ্বারা বাট্টা করে যে জিডিপি বা Inflation adjusted GDP) বৃদ্ধির হারের গতি প্রকৃতি বিচার করা। একথা বোধ হয় সকলেই জানি যে ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদন হয় তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে থেকে যথা— কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্র; শিল্পক্ষেত্র ও সেবাক্ষেত্র। এই তিনটি ক্ষেত্রের উৎপাদিত জিডিপি বৃদ্ধির হারের গতি প্রকৃতি গত ১০-২০ বছর বিশ্লেষণ করলে একটা ধারণা পাওয়া যায়। এদের ভবিষ্যৎ গতি প্রকৃতি পরিমাপ সম্পর্কেও ধারণার জন্য রাশিবিজ্ঞানে বিশেষ পদ্ধতি আছে।

অতি সম্প্রতি আমি আমার একটা গবেষণাতে (ভারতের আর্থিক উন্নতির উপর) ভারতের প্রকৃত মোট জাতীয় উৎপাদন ও তার ক্ষেত্রগত অবদানের এবং তাদের বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতির একটা বিশ্লেষণ করেছি। দশক ভিত্তিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, ১৯৭০ সালে ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদনে ক্ষেত্রগত অবদানগুলি ছিল এই রকম : কৃষিক্ষেত্রে ৫৬.৮৮ শতাংশ, শিল্পে ১৭.৭৭ শতাংশ ও সেবাক্ষেত্র থেকে ২৫.৩৯ শতাংশ। ১৯৮০ সালে এগুলি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৮.৮৫; ১৮.৬৩ ও ৩২.৫ শতাংশে। আবার ১৯৯০-এ কৃষি, শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রের অবদান ছিল যথাক্রমে ৪২.৭ শতাংশ, ১৯.৮৪ ও ৩৭.৪৫ শতাংশ। এই তথ্যগুলি সারণি-১ দেওয়া হলো।

সারণিতে দেখা যাচ্ছে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে, কৃষি ক্ষেত্রের অবদান ক্রমাগত কমছে ও ২০১৯-এ তা ১৮.০২ শতাংশে নেমেছে। অন্যদিকে শিল্পক্ষেত্রের অবদান ২০১৯-এ দাঁড়িয়েছে ২০.৭৬ শতাংশ। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেবাক্ষেত্রের অবদান দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালে যা ছিল ৪৪.৭ শতাংশ। ২০১৯-এ তা ৬১.২২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উন্নয়নের তত্ত্ব বলে দেশের অর্থনীতির যত উন্নতি হবে, জাতীয় উৎপাদনে কৃষিক্ষেত্রের অবদান তত কমবে। শিল্পক্ষেত্রের অবদান তত বাড়বে এবং সেবা ক্ষেত্রের অবদান সবচেয়ে দ্রুত ও বেশি হারে বাড়বে। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে শিল্পের অবদান খুব সামান্য বাড়লেও সেবাক্ষেত্রের অবদান চমকপ্রদ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।


## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

আমরা সকলেই মোটামুটি ভাবে জানি যে আমরা বর্তমানে বাস করছি ডিজিটালাইজেশন, কৃত্রিম মেধা ও তথ্য এবং সংযোগের কৃৎকৌশলের যুগে। বর্তমানে কোনো পরিপূর্ণ দ্রব্যের যন্ত্রাংশ এক দেশে তৈরি হয়ে সেখান থেকে ওইগুলি অন্যদেশে সংযোজিত হয়ে পরিপূর্ণ দ্রব্যে পরিণত হয়। আবার আর এক দেশ থেকে তার বাজারীকরণ করা হয়। সুতরাং একটা দেশেই বড়ো বড়ো শিল্প তৈরি হয়ে দেশের শিল্পের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাবে ও কর্মসংস্থানও বিপুল পরিমাণে বাড়বে, তা বোধহয় বর্তমান যুগে আশা করা যায় না। উৎপাদন কৌশল যত উন্নত হবে তত তা কম শ্রমনিবিড় হবে। অর্থাৎ শ্রমের ব্যবহার কম হবে। তাছাড়া ভারতবর্ষে অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রাধান্য বেশি। মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৯১ শতাংশই হয় অসংগঠিত ক্ষেত্রে যথা— কৃষি, অতিক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃতি। বর্তমানে ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদনের MSME-র অবদান ৩০ শতাংশ এবং কর্মসংস্থানে এর অবদান প্রায় ৮০ শতাংশ।

**সারণি-১ : দেশের মোট প্রকৃত জাতীয় উৎপাদনে ক্ষেত্রগত অবদান (শতাংশে)**

| বছর/ক্ষেত্র | ১৯৭০ | ১৯৮০ | ১৯৯০ | ২০০০ | ২০১০ | ২০১৫ | ২০১৯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কৃষি ও সহযোগী | ৫৬.৮৮ | ৪৮.৮৫ | ৪২.৭১ | ৩৪.২৭ | ২৩.০৩ | ১৮.৯৪ | ১৮.০২ |
| শিল্প | ১৭.৭৭ | ১৮.৬৩ | ১৯.৮৪ | ২১.০২ | ২২.০৪ | ২১.৬৯ | ২০.৭৬ |
| সেবা | ২৫.৩৯ | ৩২.৫২ | ৩৭.৪৫ | ৪৪.৭১ | ৫৪.৯৩ | ৫৯.৩৫ | ৬১.২২ |

**সূত্র : লেখকের নিজস্ব হিসাব (এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি ডেটাবেস থেকে)**

**সারণি-২ : প্রকত জিডিপি ও তার ক্ষেত্রগুলির বার্ষিক বৃদ্ধির হার (শতাংশে)**

| বছর/ক্ষেত্র | ১৯৭০-১৯৭৯ | ১৯৮০-১৯৮৯ | ১৯৯০-১৯৯৯ | ২০০০-২০০৯ | ২০১০-২০১৯ | ১৯৭০-১৯৮৯ | ১৯৯০-২০১৯ | ১৯৭০-২০১৯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জিডিপি | ২.৩৩ | ৪.৩ | ৪.৬০ | ৬.৭৪ | ৫.৭০ | ৩.৬২ | ৬.১৯ | ৫.৩১ |
| কৃষি ও সহযোগী | ২.৩৩ | ৪.৩ | ৪.৬০ | ৬.৭৪ | ৫.৭০ | ৩.৬২ | ৬.১৯ | ৫.৩১ |
| শিল্প | ৩.০৭ | ৫.০১ | ৪.৬৩ | ৭.৪০ | ৫.০৭ | ৪.২৪ | ৬.৩৫ | ৫.৬৩ |
| সেবা | ৫.৬১ | ৫.৩০ | ৬.৩৫ | ৮.৫৯ | ৬.৮৬ | ৫.৪৪ | ৭.৯৩ | ৭.১৮ |

**উৎস : লেখকের নিজস্ব হিসাব (সূত্র : এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি ডেটাবেস থেকে)**

সুতরাং ভারতকে ৫ ট্রিলিয়ন জিডিপি-তে যেতে হলে সেবাক্ষেত্র এবং এই বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্র তথা শিল্পের উপরেই বেশি জোর দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আর্থিক নীতিতেও সেই প্রবণতাই প্রতিফলিত হচ্ছে। তিনি গত কয়েক বছর ধরেই ক্ষুদ্র, কুটির, মাঝারি শিল্প, হস্তশিল্প, সেবা ক্ষেত্র, ডিজিটালাইজেশন, আইসিটি, সমবায় উৎপাদন ও সেবা; স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রসার পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং এই সমস্তগুলিকে আর্থিক সংযুক্তিকরণ করা প্রভৃতির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং তা গত কয়েক বছরের বাজেট পর্যালোচনা করলেই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সুতরাং ভারতের অর্থনীতি যে ৫ ট্রিলিয়নের অর্থনীতিতে অদূর ভবিষ্যতে পৌঁছাবে তা সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

এখন ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির যে প্রধান তিন খুঁটি যথা কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্র; শিল্প এবং সেবাক্ষেত্র। এদের উন্নতির (উৎপাদন বৃদ্ধির) হারের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যাক। সারণি-২-তে ভারতের প্রকৃত ডিজিপি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির বার্ষিক বৃদ্ধির হারগুলি দেখানো হলো।

সারণি-২ থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতে আর্থিক সংস্কারের আগে অর্থাৎ ১৯৭০-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত জিডিপি-র বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৬২ শতাংশ যা সংস্কার পরবর্তী যুগে অর্থাৎ (১৯৯০-২০১৯ সাল পর্যন্ত) প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে বছরে গড়ে ৬.১৯ শতাংশ। এখন এই সংস্কার পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় এবং সংস্কার পরবর্তী বছরগুলিতে ক্ষেত্রগত জিডিপি-র মোট জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির হারগুলি দেখা যাচ্ছে সমস্ত ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন কৃক্ষেত্রের উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ২.৩১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩.১৭ শতাংশ হয়েছে, শিল্পের ক্ষেত্রে তা ৪.২৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬.৩৫ শতাংশ। এবং সেবা ক্ষেত্রের বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার আরও উল্লেখযোগ্য ভাবে ৫.৪৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭.৯৩ শতাংশে পৌঁছেছে।

এক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার যে পরিমাপের সময়সীমাটা ২০২১ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়নি তার কারণ ২০২০ সাল থেকে তীব্র করোনা পরিস্থিতির জন্য শুধু ভারতের নয় সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতির গতিবৃদ্ধি যথেষ্ট ধাক্কা খেয়েছে। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার যে আর্থিক সংস্কার পরবর্তী যুগে (১৯৯০-২০১৯) জিডিপি তথা এর তিনটি ক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের যে বার্ষিক বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করা গেল তাতে ভারতের অর্থনীতি যে অদূর ভবিষ্যতে ৫ ট্রিলিয়ন জিডিপি-র অর্থনীতিতে পৌঁছাবে তা সন্দেহের অবকাশ রাখে না। ভারতের অর্থনীতি কোভিডের ধাক্কা ইতিমধ্যেই সামলে নিয়েছে। এবং কৃষি, শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রগুলি আবার তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির আগের গতিতে অর্থাৎ পুরানো ছন্দে ইতিমধ্যেই ফিরে গেছে। এর সঙ্গে বর্তমান ভারত সরকার, অভ্যন্তরীণ শিল্প, MSME, পরিকাঠামো, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, ডিজিটালাইজেশন প্রভৃতিতে যে মাত্রায় বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে ও প্রতিটি বাজেটে পরিকল্পিত মূলধনী ব্যয় যে হারে বাড়াচ্ছে ও সেবাক্ষেত্রের উন্নতির হার যে গতিতে বাড়ছে তাতে ৫ ট্রিলিয়ন প্রকৃত জিডিপি-র লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো খুব সহজসাধ্য হবে বলেই মনে হয়।

এখন দেখা যাক এই লক্ষ্যমাত্রাতে পৌঁছানোর জন্য ভারত সরকার অন্যান্য কোন কোন চালিকাশক্তির উপর বেশি গুরুত্ব

আরোপ করেছে। এই চালিকা শক্তিগুলিকে আমি দুভাগে ভাগ করছি যথা : ১. অভ্যন্তরীণ চালিকা শক্তি, ২. বৈদেশিক ক্ষেত্রের চালিকাশক্তি। অভ্যন্তরীণ চালিকাশক্তির তিনটি প্রধান খুঁটি ও তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের গতি-প্রকৃতি আগেই পর্যালোচনা করেছি ও তার থেকে সহজেই মন্তব্য টানা যায় যে ৫ ট্রিলিয়ন জিডিপি-র অর্থনীতি অদূর ভবিষ্যতে অধরা নয়। অভ্যন্তরীণ চালিকাশক্তিগুলির সঙ্গে আরও অন্যান্য সহযোগী চালিকাশক্তি আছে। এখন সেগুলি আলোচনা করা যাক। এগুলি হলো বর্তমান ভারত সরকার গ্রাম-শহর নির্বিশেষে দেশের সমস্ত স্তরের মানুষের জন্য বিশেষত সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষজনের জন্য; শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবক- যুবতীদের জন্য, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সমবায় উন্নয়নের জন্য, বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েছে। যেমন MGNREGA (মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রকল্প/আইন); জাতীয় গ্রামীণ মানুষের জীবিকা অর্জনের লক্ষ্য (National Rural Livelihood Mission); জাতীয় গ্রামীণ উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্প (National Rural Entrepreneurship Development Programe) অন্যান্য Flagship Programme যেমন স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া; ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং আত্মনির্ভর ভারত; মেক ইন ইন্ডিয়া ও এদের সঙ্গে ভোকাল ফর লোকাল প্রোগ্রাম বা স্থানীয় সম্পদ ও দক্ষতা দিয়ে উৎপাদন করা। এই সমস্ত সহযোগী প্রোগ্রামগুলিকে স্থিতিযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতির কৌশলের (Sustainable Inclusive Growth Strategy) আওতায় আনা হয়েছে ও তার সঙ্গে এগুলিকে আর্থিক দিক থেকে সংযুক্তি করণের জন্য (Financial Inclusion) ব্যাংকে জনধন অ্যাকাউন্ট প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ চালিকা শক্তিগুলির মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য হলো ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পে অত্যধিক জোর, এনার্জি উন্নয়নে বিশেষত পুনর্নবীকরণ যোগ্য এনার্জি তৈরিতে অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে Bio-Economic Hub তৈরিতে আরও বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ নানা ধরনের Vaccine তৈরি, ভেষজ ঔষধ তৈরি প্রভৃতিতে জোর দেওয়া হয়েছে। মনে রাখতে হবে এই দ্রব্যগুলির বিদেশি চাহিদা প্রচুর বেড়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে এগুলি থেকে ২০২২-২৩ সালে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা এসেছে ৮০ বিলিয়ন ডলার এবং এই ক্ষেত্রটির ২০২২-২০২৩ অর্থবর্ষে উৎপাদন বেড়েছে ১৪ শতাংশ। এই ক্ষেত্রটির ২০২৪-২৫ সালে উৎপাদন ১৫০ বিলিয়ন ডলার হবে বলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর; Clean Ganga মিশন, Sewage, শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা হসপিটাল ও তার পরিকাঠামো উন্নয়নে অত্যধিক জোর দেওয়া প্রভৃতি। স্বভাবতই এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে যে মূলধন বিনিয়োগ হবে তা গুণক পদ্ধতিতে দেশে জাতীয় আয় তথা উৎপাদন ও নিয়োগ বাড়াতে থাকবে। সম্প্রতি একটি গবেষণা পত্রে দেখানো হয়েছে ভারতে মূলধনী ব্যয়ের গুণকের মান হলো ২.৪ অর্থাৎ ভারতে এক শতাংশ মূলধনী ব্যয় বাড়লে প্রকৃত জাতীয় আয় ২.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা অমূলক ও অধরা নয়।

এবার বৈদেশিক চালিকা শক্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : (১) সরাসরি ভারতে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ও তার গতি প্রকৃতি এবং মূলধনী বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ; (২) বৈদেশিক বাণিজ্যের চলতি খাতে ঘাটতি; (৩) আন্তর্জাতিক বাজারে পরিশোধিত ও অশোধিত তেলের দাম; কারণ ভারত বিদেশ থেকে তেল আমদানি করে। (৪) ভারতীয় মুদ্রার আন্তর্জাতিকীকরণ প্রভৃতি। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ২০০৮ সালে ভারতে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ যেখানে ছিল ১২ বিলিয়ন ডলার তা ২০২০ সালে বেড়ে হয়েছে ৮০ বিলিয়ন ডলার। ব্যালান্স অব পেমেন্ট অ্যাকাউন্টে চলতি খাতের ঘাটতিও অনেক কমে ২.২ শতাংশে নেমেছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর একটি পদক্ষেপ হলো, ভারতীয় মুদ্রার (টাকার) আন্তর্জাতিকীকরণ। ইতিমধ্যেই ২০২২ সালের জুলাই মাসে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া দেশে-বিদেশে বিশেষ টাকার অ্যাকাউন্ট খুলেছে। যার নাম Vostro Account। এতে ভারতের সঙ্গে অন্য দেশের লোকেদের, প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য সংক্রান্ত লেন-দেন ও আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে যে প্রেরণ চার্জও দেশি বিদেশি মুদ্রার রূপান্তরের জন্য যে চার্জ লাগে তা লাগবে না। এবং সরাসরি রূপান্তর মুদ্রা করা যাবে। ফলত, বৈদেশিক লেন-দেন অধিকতর সহজ হবে। ইতিমধ্যে কয়েকটি দেশ এই অ্যাকাউন্ট খুলেছে।

সুতরাং সার্বিকভাবে আমাদের মোট প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন ও তার ক্ষেত্রেগুলি উৎপাদন বৃদ্ধির হারের গতি প্রকৃতি, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চালিকা শক্তিগুলির গতিপ্রকৃতি এবং ওই সংক্রান্ত গৃহীত নীতিগুলি সর্বোপরি ভারত সরকার কর্তৃক বর্তমানে গৃহীত নীতি ও প্রকল্পগুলি; এবং আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় যথা গত আর্থিক বছরে (২০২২-২৩) জিডিপি বৃদ্ধির হার ৯.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, এগুলির ভিত্তিতে অবশ্যই বলা যেতে পারে যে ভারতের অর্থনীতির ৫ ট্রিলিয়ন জিডিপি-র অর্থনীতিতে পৌঁছানোর লক্ষ্য বাস্তবসম্মত ও অধরা নয়।

*(লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। লেখাটি গত ১৮ এপ্রিল ২০২৩, কলকাতার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজে প্রদত্ত ভাষণের অংশ)*

*With Best Compliments from -*

**A**

**Well Wisher**

# বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করার সোনালি সময় চলছে

**সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী**

অবাক হবার কিছু নেই। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ হবে অসাম্প্রদায়িক। এই ছিল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস। সংবিধান রচনাও হলো। বলা হলো ধর্মনিরপেক্ষতার কথা। পথ চলা শুরু হলো একটা নতুন দেশের। কে জানতো তার বুকে হিন্দু নিধনের বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে সংগোপনে। আস্তে আস্তে আসল রূপ ফুটে উঠতে শুরু হলো। ঢাকার শাখারিপট্টিতে বনেদি হিন্দুদের বাস। প্রথম আঘাত আসে সেখানেই। দিবালোকে হিন্দু রমণীদের তুলে এনে ধর্ষণ, হত্যা ও গুমের মধ্য দিয়ে নির্যাতনের প্রথম ট্রায়াল রান হলো নির্বিঘ্নে। এর পরে শুরু হলো সম্পদ ও সম্পত্তি জোর করে দখল নেওয়া। এ কাজে সরাসরি অংশ নিল তৎসময়ের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামি লিগ। শুরু হলো হিন্দু সম্পদ লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতা। কার আগে কে লুণ্ঠন করবে। রাতারাতি অনেকেই বনে গেল কোটিপতি। হিন্দুরা হয়ে উঠলো অসহায়। ক্রমে এ লুণ্ঠন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে গেল। মৌলভিরা ফতোয়া জারি করলেন অমুসলমানদের সকল সম্পদ হবে গনিমতের মাল। অমুসলমানদের ধর্মান্তরিত করতে পারলে পাবে বেহেস্ত। এইবার আর ঠেকাবে কে! বেহেস্তের আশায় নির্যাতনের মাত্রা কয়েকগুণ বেড়ে গেল। দেশ ও দেশের আইন পরোক্ষভাবে আশকারা অব্যাহত রাখলো। সারা দেশে একযোগে শুরু হলো হিন্দুদের উপর নির্যাতন।

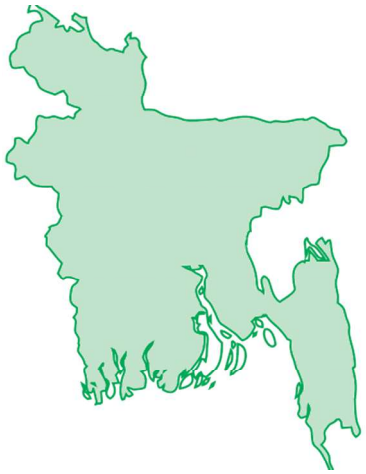

অতঃপর সংবিধান পালটিয়ে হোসেইন মহম্মদ এরশাদের দল এগিয়ে দিল আরেক ধাপ। সংবিধানে বলা হলো রাষ্ট্রধর্ম হবে ইসলাম। আশকারা কাকে বলে! এতে ভীষণ খুশি হলো লুণ্ঠনকারীরা। এইবার প্রশাসনও লুণ্ঠন ও হিন্দু সম্পদ ও সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ায় অবতীর্ণ হলো। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হিন্দুরা দেশ ত্যাগে বাধ্য হলো। হিন্দুদের অনেকেই সর্বস্ব ফেলে শূন্য হাতে ভারতে চলে গেল। ফেলে আসা সম্পত্তিকে চিহ্নিত করা হলো শত্রু সম্পত্তি হিসেবে। হিন্দুরা হয়ে উঠলো বাংলাদেশের স্বীকৃত শত্রু। এ সব কিছুর মূল উদ্দেশ্য হলো হিন্দু শূন্য দেশ বানানো। ক্রমে হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফেনি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ভৈরব, সিলেট, নরসিংদী, ঢাকার শাঁখারিপট্টি, খুলনা, বরিশাল, যশোর-সহ সারাদেশের হিন্দুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা বেহাত হয়ে গেল। পরিসংখ্যান প্রকাশিত হওয়ার পরেই অনেক বুদ্ধিজীবীর চোখ বড়ো হয়ে গেল। তারা ভাবতেও পারেননি এমন হারে হিন্দু কমে গেছে। ৩৩ থেকে সোজা ৮ শতাংশ। ঢাকার একজন বুদ্ধিজীবী যাকে অনেকেই দার্শনিক হিসেবে জানেন তিনি বলেছিলেন হিন্দুদের সম্পদ আর ব্যাংকের টাকা ফেরত দিলে কয়েক লক্ষ মুসলমান যারা এখন শিল্পপতি, বড়ো ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, তাদের গামছা পরে গ্রামের বাড়ি যেতে হবে। কথাটা ফেলনা না। একদম খাঁটি ও বাস্তব কথা তিনি বলেছিলেন।

সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে চলেছে এক নজিরবিহীন ঘটনা। খোদ সরকার হিন্দু সম্পদ সম্পত্তি লুণ্ঠনে অবতীর্ণ হয়েছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোল্লাবাদীদের খুশি করার জন্য সারাদেশে মডেল মসজিদ বানাচ্ছে। বগুড়ার দিলীপ সরকারের বাপদাদার সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে সরকারি অনেক স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। মাত্র ষোলো শতাংশ জমি বাকি ছিল তাদের। এই জমিতেই তারা বসবাস করতেন। সম্প্রতি আওয়ামি লিগ সরকার সে বসতভিটায় মডেল মসজিদ বানানোর কাজ চূড়ান্ত করেছে। ফলে দিলীপ সরকারদের আর কোনো অবলম্বন থাকলো না। এক সময়ের সঙ্গতিপূর্ণ সরকার পরিবার সরকারি লুণ্ঠনের কারণে হয়ে গেল পথের ভিখারি। এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকার প্রেসক্লাবের সামনে দিলীপ সরকার অভিযোগ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাতে কর্ণপাতও করেননি। আমাদের তখন বুঝতে দেরি হয় না যে, যা কিছু হচ্ছে হিন্দু শূন্য করতেই সরকার জড়িত রয়েছে।

এদিকে খুলনার শিববাড়ি মন্দির মোড়ের নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু চত্বর লিখে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নোটিশ জারি করেছে। অসাম্প্রদায়িকতার এই হলো নমুনা। হিন্দুদের টার্গেট করে এখন চলছে লুণ্ঠনের সোনালি সময়।

ঢাকার উয়ারীতে লীলাবতী রায় নামে একজন হিন্দু মহিলা যিনি প্রথম এমএ ডিগ্রি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি ১২ বিঘা জমিতে নিজের নাম না দিয়ে নারী শিক্ষার জন্য 'নারী শিক্ষা মন্দির' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। সেটি এখন শেরেবাংলা স্কুল ও কলেজ। লজ্জার মাথা খেয়ে অকৃতজ্ঞ সরকার প্রতিষ্ঠাতার নামটাও মুছে দিয়েছে। অভয় দাস লেনে তিনি গড়ে তুলেছিলেন দীপালী সঙ্ঘ। সেটি এখন কামরুন্নেসা স্কুল। কতটুকু চৌর্যবৃত্তির বিকাশ ঘটলে এমন হতে পারে আমাদের জানা নেই। এই লীলা রায় নারী শিক্ষার জন্য ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। ইতিহাসে তার নাম নেই। একটাই অপরাধ লীলাবতী হিন্দু।

বরিশালের দুর্গাদিঘি যা হিন্দুদের কয়েক হাজার বছরের পুরানো স্থাপনা, সেটিও কুক্ষিগত করার কাজ চূড়ান্ত হয়েছে। সেটি নেবেন একজন ক্ষমতাশালী আওয়ামি লিগ নেতা। ঢাকার টিকাটুলিতে স্থাপিত মদনেশ্বর জিউ মন্দির এখন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতির সম্পদ। যারা দেশকে স্বাধীন করেছেন তাদের অনেকেই এখন লুণ্ঠনকারী। কলঙ্কের ছাপ তাদের কপালে। এখন শোনা যাচ্ছে হিন্দুদের কোনো মুসলমান বসবাসের জন্য ভাড়া দেবেন না। ব্যবসা করার জন্য দোকানও ভাড়া দেবেন না। অবশেষে কষ্টের সঙ্গেই বলতে হয়, হিন্দুরা না হয় দেশ ছাড়বে। তারা চলে গেলে থাকবে শুধুই মুসলমান। তারা আবার আফগান হবে না তো?

# সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরে আজও টিকে রয়েছে টোটো উপজাতির মানুষরা

**তরুণ কুমার পণ্ডিত**

পশ্চিমবঙ্গে নানান উপজাতির মানুষেরা বসবাস করলেও বিলুপ্তপ্রায় উপজাতি হিসেবে 'টোটো'রা আজও নিজেদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে আঁকড়ে কষ্টের মধ্যে হিন্দু হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রয়েছে। এদের জনসংখ্যা খুব ধীরে ধীরে বাড়ছে। ১৯০১ সালে যেখানে টোটোদের সংখ্যা ছিল ১৭২ জন, ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা ৩২১ জন এবং একশো বছর পর ২০০১ সালে সেই সংখ্যা হয় ১০৮৪ জন। বর্তমানে ২০২৩ সালে টোটো উপজাতিদের এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬০০ জন। টোটোরা বৃহত্তর ইন্দো মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর একটি বিচ্ছিন্ন শাখা। এঁরা ১৩টি গোষ্ঠী বা গোত্রে বিভক্ত। ১৯৯০ সালে টোটোপাড়ায় প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন হয়। পরে ১৯৯৫ সালে হোস্টেল-সহ একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। টোটোদের মোট জমির পরিমাণ ৩৩৩ একর। এখানে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে স্নাতক হাতে গোনা, মাত্র ৪০ জন এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করেছেন। ধনীরাম টোটোর পুত্র ধনঞ্জয় টোটো একমাত্র লাইব্রেরি সাইন্স নিয়ে এমএ পাশ করেছেন।

উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তর প্রান্তে ভুটান সীমান্তে তোর্সা নদীর ধারে তাদিং পাহাড়ের কোলে পাঁচটি গ্রাম নিয়ে টোটো পাড়ায় এই বিলুপ্তপ্রায় উপজাতিদের বসবাস। এখানেই একটি গ্রামে বাস করেন এবারের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো। ৫৯ বছরের এই ধনীরাম টোটো এবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের রায়গঞ্জের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। হ্যাঁ, এই অত্যন্ত সহজ সরল বিলুপ্তপ্রায় উপজাতির ধনীরাম টোটো নিজেদের প্রকৃতি পূজক এবং হিন্দু হিসেবে পরিচয় দিতে ভালোবাসেন। আলাপচারিতায় তিনি বললেন, ছোটো থেকেই আমি স্বপ্ন দেখতাম যে টোটো উপজাতিদের জন্য কিছু করবো। তারপর কোনো প্রকারে মাধ্যমিক পাশ করলাম এবং উপজাতি সম্প্রদায় বলেই অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরে চাকুরি পাই। কিন্তু মনে মনে ভাবতে থাকি, যদি পৃথিবীর সব জনজাতির পৃথক অক্ষর ও ভাষা থেকে থাকে তবে টোটোদের নিজেদের ভাষার জন্য আলাদা লিপি থাকবে না কেন? সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতেই আমি কাজ শুরু করি এবং আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে বলতে পারি টোটো ভাষার স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ লিপি তৈরি করার সেই কাজ আমি নিপুণভাবে সম্পূর্ণ করেছি।

আর তাঁর এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রপতির নিকট হতে এবারের ২০২৩ সালের পদ্মশ্রী পুরস্কার পাওয়া। তিনিই প্রথম ৩৭ শব্দের অক্ষররাশি তৈরি করেছেন টোটো উপজাতিদের জন্য। ইতিমধ্যে তিনি টোটোদের নিয়ে বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সাহিত্য রচনা করেছেন। তিনি প্রচুর কবিতা, উপন্যাস, গল্প ও রম্যরচনা সৃষ্টি করেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর লেখা পাঁচটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ধানুয়া টোটোর কথামালা, টোটো জনজাতির কথা, ঈশান কবিতা কাব্যগ্রন্থ গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ধনীরাম টোটো ১১টি ভাষায় কথা বলতে পারেন। বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় লিখতে পারেন এবং বাঁশি ও ঢোল বাজাতে পারেন। ১৯৯৩ সালে বিলুপ্তপ্রায় টোটো উপজাতিদের প্রতিনিধি হিসেবে ধনীরাম টোটো তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মার আহ্বানে গণতন্ত্র দিবসে নতুন দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন। এই উপজাতিরা প্রকৃতি পূজা করলেও চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে সরদে উৎসবে শুয়োর বলি দেয়। বর্ষাকালে অংচু উৎসব এবং শীতকালে ফসল কাটার উৎসবে নাচগানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করে থাকে। প্রকৃতির সবকিছুই তাদের উপাস্য। এঁদের প্রধান দেবতা ঈশাপা বা মহাকালী হলেও মহাকালের পূজা করতেও এঁদের দেখা যায়। পূজাতে টোটোরা ইউ নামক একপ্রকার পানীয় দেবতাকে উৎসর্গ করেন। চাষ আবাদে এঁরা খুব একটা দক্ষ নন। যদিও একসময়ে এখানে উচ্চমানের কমলালেবুর চাষ হতো কিন্তু এখন সামান্য কিছু ধান ও সুপারির চাষ ব্যাপক ভাবে হয়ে থাকে।

অনেকে আবার পশুপালন করে (ছাগল, গোরু ও শুয়োর) জীবিকা নির্বাহ করে। এখন অবশ্য অনেকেই পার্শ্ববর্তী সিকিমে কাজের জন্য যাচ্ছে। ইদানীং জলদাপাড়া থেকে হাতির দল এসে জমির ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন ধনীরাম টোটো। বিলুপ্তপ্রায় টোটো উপজাতিদের মধ্যে এখন পড়াশোনায় উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। ধনীরাম টোটো পদ্মশ্রী পুরস্কার পাওয়ায় তাঁর কথাকে গ্রামবাসীরা গুরুত্ব দিয়ে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের মতো সংগঠনের প্রবেশ ঘটিয়েছে। প্রসঙ্গত, সঙ্ঘের প্রথম বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তিনি গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ এবং সঙ্ঘের সেবা কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

# বাংলাদেশ কি ভাষাভিত্তিক দেশ

ভাষাভিত্তিক দেশ 'বাংলাদেশ', কথাটি বেশ প্রচলিত। কথাটি সত্য নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, প্রথমত, বাহান্ন থেকে ধারাবাহিক আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ৬-দফার মাধ্যমে, যেখানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল মূখ্য। ৬-দফা নিয়ে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর হয়নি, তাই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, ৬-দফার কোথাও কি বাংলা ভাষার কথা আছে? দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে, পাকিস্তানকে ভাঙতে বা দুর্বল করতে এবং পূর্বাঙ্গনে সামরিক ব্যয় কমাতে ভারত সুযোগ পেয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেয়, এতে 'বাংলা-ভাষা' কোথায়? বরং বলা যায়, ভারত অজান্তে 'লাহোর প্রস্তাব' বাস্তবায়িত করে দেয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকা নিয়ে একাধিক মুসলমান দেশ গঠনের কথা ছিল, আজকের বাংলাদেশ তা-ই।

ভাষা ভিত্তিক কোনো জাতি গঠিত হয় না, যদি তাই হতো, তবে ইংরেজিতে কথা বলা সবাই 'ইংরেজ' হতো, তা হয়নি। একইভাবে বাংলায় কথা বললেই সবাই 'বাঙ্গালি' হয় না! বাঙ্গালি হতে হলে বঙ্গদেশের হাজার বছরের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করতে হয়, বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ কি তা করে? নাকি তাঁরা 'আরবীয়' সংস্কৃতি মননে অধিক যত্নশীল। অধিকাংশ বাংলাদেশি কি নিজেকে 'বাঙ্গালি' না 'বাঙ্গালি মুসলমান' পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন? বাংলাদেশের ভিত্তি যদি 'ভাষা' হতো, তবে ধর্ম প্রাধান্য পেতো না!

পশ্চিমবঙ্গে এখনো অনেকেই 'বাঙ্গালি' বলতে বাঙ্গালি হিন্দুদের বোঝেন, এর বহুবিধ কারণ থাকতে পারে, তবে বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষাভাষী হলেও কতটা বাঙ্গালি বলা মুশকিল। হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভাষাভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনের চেষ্টা হয়েছে। বাহাত্তরে এজন্যে বলা হতো, ঢাকা হবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু। এখন কেউ আর ওকথা মুখে আনে না। সম্ভবত অধিকাংশ বাংলাদেশি বিশ্বাস করে, বাংলা হিন্দুদের ভাষা, তাই তারা আরবিকে বুকে টেনে নিচ্ছে। বাংলা ভাষা বা বঙ্গ সংস্কৃতির চর্চা বাংলাদেশে এখন তেমন নেই। ঢাকার নাটক আগে ভালো ছিল, এখন মান কমেছে; সিনেমা বিলুপ্ত হচ্ছে, নাচ-গান বা সংস্কৃতি চর্চা যেটুকু আছে, হিন্দুরা না থাকলে তা বন্ধ হয়ে যাবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, বাংলা ভাষা বা বঙ্গ-সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে নেই, অন্তত এ মুহূর্তে তো বটেই? কারণ একটাই, ইসলামে সংস্কৃতির জায়গা নেই তাই বাংলা ভাষার কদর কম। সুতরাং বাংলাদেশ যতই ধর্মের দিকে এগোবে, ততই ধর্মভিত্তিক দেশ হবে, ভাষাভিত্তিক নয়!

—**শিতাংশু গুহ,**
নিউইয়র্ক।

# সত্য প্রকাশে ভয় কেন?

আমরা সবাই জানতে চাই। কিন্তু যা থাকে তা সংবাদপত্রের মালিকের ইচ্ছায় লেখা হয়। আর মালিকপক্ষ জানে সরকারের হয়ে না লিখলে ভালো বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে না। তাইতো সঠিক ছাপার জন্য ছোটো খাটো পত্র পত্রিকাগুলো বিজাপন না পেয়ে দিনে দিনে শীর্ণকায় হয়ে যাচ্ছে।

রামনবমীর শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রায় ইট-পাথর বা বোমা পড়লেও আপনি তা জানতে পারবেন না, কারণ এতে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। এমনি ভাবেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া ঘটনার সত্য সংবাদ আমরা পাই না। থাকি অন্ধকারে। জানার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, ছাপার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। অথচ আমাদের রাজ্যের সরকারি দল এবং তাদের মতো আরও কিছু দল মিলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অধিকার হরণের অভিযোগ নিয়ে সোচ্চার। কেন এই দ্বিচারিতা?

অতি সম্প্রতি কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ১০৪ আসন পাওয়া বিজেপি সরকার পরাজিত হয়েছে। এটা সত্য। কিন্তু সংবাদ পত্রগুলো কী কী বলছে। বলছে মোদীর দর্পচূর্ণ, অহংকারের পরাজয়, কাজ করেনি বিজেপি সরকার ইত্যাদি। তবে কী কী বলেনি। বলেনি বিজেপি আগের বিধানসভা নির্বাচনে যত শতাংশ ভোট পেয়েছিল এবার তার থেকে আংশিক এক শতাংশের কম ভোট পেয়েছে। বলতে পারা যায় প্রায় সমতুল। তাহলে কেন হারলো? কেন ১০৪ থেকে ৬৫টি আসন পেল? আসল সত্য হলো কংগ্রেস হিজাব চায়। কংগ্রেস তিন তালাক বিরোধী। কংগ্রেস তিন তালাক ব্যবস্থা চালু রেখেছিল। কংগ্রেস ও বিরোধীরা একযোগে মুসলমান মহল্লায় প্রচার করে। তাই মুসলমান সমাজ আবেগ তাড়িত হয়ে তাদের সব ভোট কংগ্রেসের ঝুলিতে উজাড় করে দেয়। মহীশূর, হাসান ও ব্যাঙ্গালোরের জেডিএসের সব মুসলমান ভোট কংগ্রেসে চলে যায়। ফলে জেডিএসের অনেক আসন কমে যায়। সংবাদপত্রগুলো কেন এটা খবর করলো না? ওদের ভয়, এই খবরে যদি হিন্দু ভোট সব বিজেপি পেয়ে যায়! মুখে মুখে ওরা বিভাজনের রাজনীতি করছে বলে বিজেপিকে সকাল সন্ধ্যা গালমন্দ করলেও আসলে ওই বিরোধীরাই দিকে দিকে চালাকি করে বিভাজনের রাজনীতি করে চলেছে। প্রসঙ্গত, বিজেপি কর্ণাটকে ১৯৯০ সালেও খুব দুর্বল ও ছোটো দল ছিল। দীর্ঘদিন কর্ণাটক এক দলকে পর পর দুবার সরকার গড়তে দেয়নি। ওখানে শিক্ষার মান উন্নত বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। সংবাদপত্রগুলি কখনও তিন তালাক বিলুপ্ত হবার পর আমাদের মুসলমান বোনেদের কেমন লাগল তার সমীক্ষা করেনি। তিন তালাকে মুসলমান মহিলারা কীভাবে অত্যাচারিত হতো তাও জানায়নি।

ভারতের ইতিহাস ঠিক মতো দেশবাসী আজও জানতে পারেনি। এই ইতিহাস অত্যাচারী শাসককে অত্যাচারী বলে

ফ ঃ ৩

দেখায়নি। ইতিহাস কখনও জানায়নি হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজকে কীভাবে ঘোরি হত্যা করেছিল। অত্যাচারের মাত্রা কতটা তীব্র ছিল। পৃথ্বীরাজের স্ত্রী সংযুক্তার সঙ্গে কী অভব্য ব্যবহার করা হয়েছিল। কেন স্বাধীন ভারত তা জানতে পারলো না। কোন সত্য লুকিয়ে আছে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সব কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সবাই মুসলমান থাকার মধ্যে। এই রহস্যের পর্দা ওঠার আশু প্রয়োজন।

**—শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

## তালিবান সেবায় ভারতীয় গম

সম্প্রতি সমস্ত সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়েছে চরম খাদ্য সংকটে ভোগা তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০ হাজার মেট্রিক টন গম পাঠাচ্ছেন। এছাড়াও ভারত সরকার সেখানকার পার্লামেন্ট হাউস এবং ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল তৈরি করে দিচ্ছে। এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বাজপেয়ীজীর আমলে নেপাল বিমানবন্দর থেকে একটি যাত্রীবাহী ভারতীয় বিমান তালিবানরা অপহরণ করে কাবুল নিয়ে যায়, সেই বিমান উদ্ধার করার জন্য কাবুল সরকার কোনো সাহায্যই করেনি, বাধ্য হয়েছিল ভারত সরকার জেলবন্দি কয়েকজন উগ্রপন্থীকে মুক্তি দিয়ে বিমানটি মুক্ত করে। ওই হাসপাতালে তৈরি হলে তালিবানরা কাশ্মীরে পণ্ডিতদের হত্যা করবে, সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত হলে ওই হাসপাতালে চিকিৎসায় সুস্থ হলে আবার ভারতের উপর হামলা চালাবে। ২৪-এর ভোটের কথা চিন্তা করে মোদীজী মুসলমান ভোট পাওয়ার জন্য নানা চিন্তা ভাবনা করছেন, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক রিপোর্টে প্রকাশ পার্লামেন্টের ৭০টি আসনের ফলাফল নির্ভর করে মুসলমান ভোটের উপর, আমি হলফ্ করে বলতে পারি কোনো মুসলমানই বিজেপিকে ভোট দেবে না। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কথায় : ভারতে একজনই জাতীয়তাবাদী মুসলমান আছেন তার নাম জওহরলাল নেহরু।

আমাদের কয়েক হাজার সেনার প্রাণের বিনিময়ে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়েছে। মুজিব পাক জেল থেকে ছাড়া পেয়েই বলেছেন, 'বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান দেশ'। এছাড়াও তিনি অরগানাইজেশন অব মুসলিম কোঅপারেশন (যার সদস্য ৫৯টি মুসলমান দেশ) সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন যে ওআইসি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিলেন। এছাড়াও এখনো বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান একজন রাজাকারকে বেশি আপন মনে করেন সে হয়তো মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন সেখানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশ।

মওলানা ভাসানী ৭১-এর মুক্তি যুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেন। পাকসেনা তার বাড়িঘর কামানের গোলায় গুঁড়িয়ে দেয়। দেশ স্বাধীন হলে তিনি দেশে ফিরলে ভারত সরকার তার বাড়িঘর পুনঃনির্মাণ করে দেয়। এছাড়াও ইন্দিরার নিকট আবেদন করলে তাকে ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। সেই ভাসানী ১৯৭৬ সালে লক্ষাধিক বাংলাদেশী মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে ফরাক্কাবাঁধ গুঁড়িয়ে দিতে অগ্রসর হয়। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাদেরকে বর্ডারে আটকে দেয়। তাই মোদীজীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সাপকে যতই দুধ-কলা ভোগ দেওয়া হোক না কেন তার স্বভাব পরিবর্তন করতে পারবে না। কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। তাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবো তালিবানদের দয়ায় (আশীর্বাদ) অফুরন্ত ছোঁয়ার (পুণ্য) অর্জন করে তৃতীয়বারের জন্য নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে পারেন কিনা?

**—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

## স্বপ্নের কলকাতা চর্ম নগরী

স্বপ্ন দেখেছিলাম এই চর্ম নগরী বিশ্ব মানের হবে। না হলো না। আমাদের তথা বাঙ্গলার স্বপ্নভঙ্গ হলো। শিল্প মরু এই রাজ্যের টিম টিম করা এই শিল্পটি এখনও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এক লক্ষ মানুষের রুজি রোজগারের স্থান। অথচ শাসকদলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে জেরবার এই নগরী এখন শিল্পপতি, শ্রমিক, রাসায়নিক সামগ্রিক ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মানুষের কাছে দুঃস্বপ্ন।

এতদিন এই নগরীর পরিচালন সংস্থা CLCTA (Calcutta Leather Complex Tanners Association)-র শীর্ষে ছিলেন ইমরান খান (প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী জাভেদ খানের পুত্র)। এই পরিচালকদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। আর্থিক দিক থেকে উন্নত এই নগরী কাঁচা পয়সা লেন-দেনের সোনার খনি।

এই অঞ্চলের ভূমিপুত্র হলো শওকত মোল্লা তিনি শাসকদলের বিধায়কও বটে। এই মোল্লাজী আবার কয়লা কেলেঙ্কারিতেও যুক্ত সিবিআই দপ্তরে হাজিরাও দিয়েছেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এই মোল্লার সাগরেদ রাকেশ রায়চৌধুরীও জুটেছে। সেও স্থানীয়। ইমরান এতদিন তাঁর ক্ষমতা বলে একরকম তানাশাহী চালিয়েছে। চামড়ার দাম কী হবে তার নির্ধারণ খরচ হয় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য। সেখানে ও কাটমানির অভিযোগ উঠেছে ইমরান পরিচালিত পরিচালনা সংস্থায়। এমন সোনার খনি হাতছাড়া করতে চাইছে না মোল্লা— রাকেশ গোষ্ঠী। তাঁরা ছুঁতো নাতায় পরিচালনা সংস্থার শ্রমিকদের খেপিয়ে তুলেছে। তারা বর্জ্য পরিশোধন সংস্থায় ধর্মঘট ডেকেছে এবং মাসাধিককাল সংস্থার দরজায় তাঁবু টানিয়ে ধরনায় বসেছে। ফলত, সাড়ে তিনশো চালু ট্যানারির যাবতীয় বর্জ্য পরিশোধন সংস্থায় যেতে না পেরে প্লাবিত হচ্ছে রাস্তাঘাট। ইমরানকে এই অবস্থায় পরিচালন সংস্থার কার্যালয়ে ঢুকতে দিচ্ছে না মোল্লাপন্থী শ্রমিকরা। যার ফলে বর্জ্য দূষিত জলে প্লাবিত হচ্ছে পার্শ্ববর্তী এলাকা। এদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই রাজ্যের প্রশাসনিক মহলের।

**—তারক সাহা,**
হিন্দমোটর, হুগলী।

# আধুনিকা নারীদের হাতে কি পরিবার আদৌ সুরক্ষিত?

**সায়নী রায়**

ভারতীয় আধুনিকা নারীরা কি আদৌ তাদের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখছেন? নারীই তো পরিবারের ধারক। নারীর হাতেই তো পরিবারের সকলের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, শরীর-স্বাস্থ্য সবকিছু নির্ভর করে। তবুও এমন উদ্ভট প্রশ্ন কেন?

বর্তমানের এই কর্মব্যস্ত সময়ে সকলের হাতে সময় কম। বিশেষত নারী যদি চাকুরিরতা হন, তবে তো কোনোও কথাই নেই। সংসার, সন্তান, কর্মক্ষেত্র সামলে সময় বের করা— নৈব নৈব চ। তবুও আগে যখন নারীর জগৎ সংসারের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত ছিল, তখন তাদের অবসর ছিল প্রচুর। তাই অবসর সময়গুলোতে বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি চলতো রান্না নিয়ে 'এক্সপেরিমেন্ট'। ঋতুভেদে জলখাবারে তাঁরা নিয়ে আসতেন বৈচিত্র্যের স্বাদ। আর সেগুলিতে যেমন থাকতো স্বাদ, তেমনি থাকতো পুষ্টিগুণ। যেমন গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্য বাড়ির মা, জেঠিমা, ঠাকুমারা বানাতেন আমপানা, বিভিন্ন প্রকারের চাটনি, আচার, আমসত্ত্ব, কাসুন্দি ইত্যাদি। গরমের মরশুমে আম তখনও ছিল, এখনও আছে। সেই আম বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াকরণ করে ব্যবহার করার কৌশল তাঁরা জানতেন। তাই একদিকে সেইসময় টাটকা ফল হিসাবে যেমন আমের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। তেমনি পরবর্তী মাসগুলোয় যাতে আমের স্বাদ বাড়ি বা পাড়া প্রতিবেশীরা পেতে পারে তারও ব্যবস্থা করতেন। এইভাবে মরশুমি ফল, সবজি সবকিছুকেই সেই সময়ে এবং অন্য সময়ে ব্যবহার উপযোগী করার একটা রেওয়াজ ছিল। এতে মরশুম এবং তার পরেও ওই সমস্ত ফল, সবজি মানুষ ব্যবহার করতে পারতো। আবার শীতকালে বিভিন্ন রকমের পুলি-পিঠে, পায়েস ইত্যাদিও মানুষকে রসনার তৃপ্তি দিত কিন্তু তাতে থাকতো না দীর্ঘকালীন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চোখরাঙানি। ভারতীয় খাদ্যাভ্যাস বা খাদ্যরুচি বিশ্বের পুষ্টিবিজ্ঞানীদের আলোচনার বিষয়। তাঁরা দেখিয়েছেন এই খাদ্যাভ্যাস মানুষকে সুস্থ সক্ষম রাখতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, তাঁরা আরো জানিয়েছেন, এই খাদ্যাভাস

আজকের বিশ্বে মেদ বৃদ্ধির মোকাবিলা করতে সক্ষম।

কিন্তু এখনকার আধুনিক নারীর ভরসা নুডলস্, বাজারে চলতি স্যুপ, কে এফ সি, ম্যাকডোনাল্ড, ডোমিনজের পিৎজা, পাস্তা, বার্গার, পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা রোল, চাউমিন, রুটির দোকান, হাজিগাজির বিরিয়ানি, চিকেন চাপ, মটনচাপ— এ তালিকা শেষ হওয়ার নয়। সময়ের সবিশেষ অনুমতি যেহেতু নেই, তাই রান্নাঘরে হয়তো কোনোমতে ভাত, ডাল বা মাছ রেঁধেই অফিস অথবা সন্তানের স্কুলে ছুটতে হয়। আর কোনোদিন যদি সময় না থাকে, তবে হোম ডেলিভারি। বাড়ন্ত বাচ্চাদের মুখের রুচি অনুযায়ী রাঁধা সম্ভব নয়। তাই বড়ো ভরসা দু' মিনিটের নুডলস্ বা বাজার চলতি হেল্‌থ ড্রিঙ্ক। আর এসব করেই স্বাস্থ্যের দফারফা। এরপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো গৃহিণীদের জন্য বিজ্ঞানের নতুন অবদান 'মাইক্রোওয়েভ ওভেন।' গ্যাসের সামনে দাঁড়িয়ে রান্না করার সময় যদি একান্তই না থাকে তখন শরণাপন্ন হতে হয় মাইক্রোওভেনের। কিন্তু এতে সময় হয়তো বাঁচে কিন্তু শরীর কি বাঁচে? নিজের অজান্তেই নারী তার পরিবারের প্রিয়জনদের কাছে বয়ে নিয়ে আসে ভবিষ্যতের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার বীজ। মাইক্রোওয়েভের ক্ষতিকারক বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকীয় তরঙ্গ ভিটামিন, পুষ্টি নষ্ট করার পাশাপাশি খাদ্যে ক্যান্সার সৃষ্টিকারক উপাদান তৈরি করে, হৃদস্পন্দন পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও কমিয়ে দেয়। আজ যদি আমরা আমাদের চারপাশের মানুষগুলোর দিকে তাকাই তবে দেখবো বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই কিছু না কিছু শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছে। এমনকী একদম ছোটো বাচ্চাদের মধ্যেও মেদ বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস, হাইপ্রেশার, ক্যানসার, চোখের জটিলতার মতো অসুখও দেখা দিচ্ছে।

এছাড়া আজকের সংসারের অত্যাবশ্যক অঙ্গ ফ্রিজও এই তালিকার বাইরে নেই। সময় ও পরিশ্রম বাঁচানোর তাগিদে বাড়ির মেয়ে-বউরা কাঁচা শাকসবজি, মাছ, মাংস থেকে শুরু করে রান্না করা খাবার— সবই রাখে ফ্রিজে। ফল যা হবার তাই, পুষ্টিগুণ নষ্ট। উপরি পাওনা কিছু রোগ।

অথচ একটু সচেতন হলেই কিন্তু এই সকল সমস্যার আংশিক সুরাহা হতে পারে। যেহেতু পরিবারের দায়িত্ব আধুনিককালেও মেয়েদের উপরেই বর্তায়, তাই স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন রেখে তাদের অত্যাধুনিক রান্নার সরঞ্জাম ব্যবহারে লাগাম পরাতে হবে। অতীতের রন্ধনপ্রণালীতে যে পুষ্টিগুণ বজায় থাকত, তা আজকের যুগে পাওয়া যাবে না ঠিকই। তবুও সময় বাঁচানোর জন্য, পরিশ্রম কম করার তাগিদে বাজার চলতি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, হোটেল-রেস্তরাঁর খাবার যতটা সম্ভব পরিবারের সদস্যদের না দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তবেই আমাদের চারপাশে অসুস্থতার প্রকোপ ক্রমশ কমবে। আর সমাজ ও দেশ পাবে সুস্থ সবল জনসম্পদ যার উপর ভিত্তি করে দেশ আরও এগোবে।

# নাকের পলিপ অবহেলার বিষয় নয়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

**নাকের পলিপ কী?** নাকের ভিতর মিউকোসা বা নরম মাংস ফুলে গিয়ে পলিপ হয়। মিউকোসা বা টিস্যুর আবরণের বিনাইন (ক্যানসারপ্রবণ নয়) বৃদ্ধি হলো নাকের পলিপ। এটি নাকের দু'দিকে অথবা একদিকে বড়ো আকারের হতে পারে। যা নিশ্বাস চলাচলের পথকে বন্ধ করে দেয়। দীর্ঘদিন এই অবস্থা চললে রক্ত জমাট বাঁধতে থাকে।

**কেন হয় :** এটি নাকের মিউকোসার উদ্দীপ্ত টিস্যুতে বৃদ্ধি পায়। মিউকোসা অত্যন্ত আর্দ্র যা সাইনাস প্রতিরোধ করে এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ুর আর্দ্রতা বজায় রাখে। সংক্রমণ রুখতে কিংবা অ্যালার্জির জন্য জ্বালার কারণে নাকের মিউকোসা স্ফীত ও লাল হয়ে ওঠে। মিউকোসা থেকে তরল ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে থাকে। দীর্ঘদিনের অ্যালার্জি জাতীয় সমস্যা থেকে মিউকোসা পলিপ হয়। দীর্ঘদিন সাইনাসে সংক্রমণ, অ্যাজমা, ধুলোবালি থেকে অ্যালার্জির সমস্যা, সিসটিক ফাইব্রোসিস, অ্যাসপিরিন থেকে অ্যালার্জি ইত্যাদির জন্যেও নাকের পলিপ হয়। জিনগত কারণেও পলিপ হয়।

**উপসর্গ :** ● নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা। ● সর্দি। ● নাকের ভিতরে অস্বস্তি বোধ। ● ঘ্রাণ শক্তি কমে যাওয়া। ● মুখ দিয়ে শ্বাসগ্রহণ। ● কপালে অথবা মুখে চাপের অনুভূতি। ● অনিদ্রা। ● নাক ডাকা। ● মাথা যন্ত্রণা।

অনেক সময় রোগী এই ধরনের উপসর্গ বারবার হলেও ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে বলে ভুল করেন। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পলিপ চিহ্নিত করা যায় না।

**চিকিৎসা :** পলিপের কোনও উপসর্গ দেখা দিলে প্রথমে এক্সরে করা হয়। তারপর নাকে নাসাল স্প্রে (ইন্ট্রা নাসাল কর্টিকো

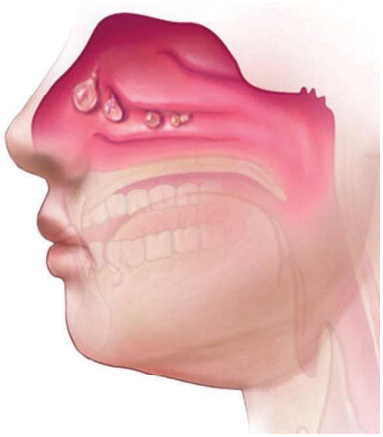

স্টেরয়েড) করা হয়। নাসাল স্প্রে সর্দি, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যা কমায়। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ না মেনে চিকিৎসার মাঝপথে স্প্রে নেওয়া বন্ধ করলে পলিপের উপসর্গ পুনরায় ফিরে আসে। নাসাল স্টেরয়েডে কোনও ফল পাওয়া না গেলে ওরাল বা ইনজেক্টবল স্টেরয়েডও দেওয়া হয়।

যদি নাসাল স্প্রে-তে পলিপের এই ধরনের উপসর্গ না কমে, তাহলে সার্জারি করে সম্পূর্ণরূপে পলিপ বের করে আনা হয়। পলিপের আকারের উপরে সার্জারি নির্ভর করে। পলিপ বড়ো আকার নিলে এফইএসএস (ফাংশনাল এন্ডোস্কোপিক সাইনাস সার্জারি) করে সাইনাসের বন্ধ হয়ে যাওয়া অংশগুলিকে ঠিক করে দেওয়া হয়। সার্জারির পরে অ্যান্টি-অ্যালার্জি চিকিৎসা, নাসাল স্প্রে এবং স্যালাইন জল দিয়ে পরিষ্কার করার মাধ্যমে পলিপ পুনরায় হওয়া প্রতিরোধ হয়।

**কীভাবে বুঝবেন :** অটোস্কোপ অথবা নাসোস্কোপ নামে আলোযুক্ত যন্ত্রের মাধ্যমে নাকের ভিতরে দেখলে পলিপ হয়েছে কিনা বুঝতে পারা যাবে। যদি সাইনাসের গভীরে পলিপ হয়ে থাকে, তাহলে নাকের এন্ডোস্কোপি করতে হয়। এছাড়াও পলিপের প্রকৃত আকার ও অবস্থান চিহ্নিত করতে সিটি অথবা এমআরআই স্ক্যান করা হয়। হাড়ের কোনও অংশে পলিপ হয়েছে কি না তা বুঝতেও স্ক্যান করা দরকার। একইসঙ্গে স্ক্যানের মাধ্যমে ক্যানসারদায়ক কোনও টিউমার হয়েছে কি না তাও বোঝা যায়। অ্যালার্জি পরীক্ষার মাধ্যমে ডাক্তারবাবু দীর্ঘদিনের নাকের কোনও সমস্যার কারণ চিহ্নিত করতে পারেন।

**পলিপ এড়াতে :** (১) অ্যালার্জির প্রবণতা থাকলে বেশিক্ষণ ধুলোবালিতে থাকবেন না। (২) ঘরে যেন সবসময় রোদ ঢুকতে পারে এমন ব্যবস্থা করুন। (৩) অ্যাজমা সমস্যা থাকলে যথাযথ সাবধানতা মেনে চলুন। (৪) বিছানার চাদর নিয়মিত পরিবর্তন করবেন। (৫) বাইরে বেরলে মাস্ক ও রুমাল ব্যবহার করতে পারেন। (৬) বাড়িতে কোনও পোষ্য থাকলে অ্যালার্জি প্রতিরোধ সাবধানতা মেনে চলা উচিত।

**ক্যানসার প্রবণ নয় :** পলিপের সঙ্গে খাবারের অ্যালার্জির কোনও সম্পর্ক নেই। পলিপ ব্যথাহীন এবং বিনাইন অর্থাৎ ক্যানসার প্রবণ নয়। দীর্ঘদিন ধরে ঘন ঘন সর্দি, সারাক্ষণ নাক বন্ধ থাকা, মাথাব্যথা এই ধরনের সমস্যা থেকে নাকে ক্যানসারপ্রবণ টিউমার হতে পারে। কিন্তু সেটি পলিপ নয়।

**সাবধানতা :** অ্যালার্জির সমস্যা, দীর্ঘদিন ধরে সর্দি, সারাক্ষণ নাক বন্ধ থাকা, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা, মাথাব্যথার মতো সমস্যায় ভুগলে দেরি না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। কারণ দীর্ঘদিনের অবহেলাতেই পলিপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা করলে পলিপ হওয়া পুরোপুরি আটকানো যেতে পারে। আর যদি ডাক্তার পলিপ হয়েছে বলে চিহ্নিত করেন তাহলে অযথা ক্যানসার হওয়ার ভয় পাবেন না। কারণ ক্যানসারপ্রবণ কোনও কিছু দেখতে পেলে ডাক্তার নিশ্চয়ই আপনাকে বায়োপসি করার পরামর্শ দেবেন। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসু। □

# সংহতির উৎসব— রথযাত্রা

**নন্দলাল ভট্টাচার্য**

**স্থিতি-একে, সাক্ষ্যে**

এ এক অলৌকিক অবতরণ। এ এক মহাজাগরণ। এ এক মহামিলনের ক্ষণ। ভক্ত ও ভগবান এই সময় মিলে মিশে হন একাকার। তাই-বা কেন? মানুষ যে অমৃতের সন্তান— সকলেই সমান। তাদের মধ্যে নেই কোনো ভেদাভেদ। বৈষয়িক বৈষম্য যাই থাক, অন্তরের সম্পদে অথবা উদ্ভবের সূত্রে প্রতিটি মানুষই এক, সমান তাদের স্বরূপ ও অধিকার। সেখানে মানুষের তৈরি বিভেদরেখা একজনকে পৃথক করতে পারে না অন্য আরেকজন থেকে। ধন সম্পদের পার্থক্য যতই থাক, জাতপাতে যতই শ্রেণিবদ্ধ করা যাক না মানব সমাজকে, তার যে কোনো মূল্য নেই, এই বার্তাটি স্মরণের মণিকোঠায় পৌঁছে দেওয়ার এক অনন্য অনুষ্ঠান রথযাত্রা। জাতপাত সে যে বাইরের একটা খোলস— তা যে নেহাতই কৃত্রিমতা— সকলের পরশে পবিত্র করা তীর্থনীর ছাড়া যে হয় না দেবতার মঙ্গলঘট ভরা— এই কথাটিই ধ্বনিত, রণিত হয় এই পরম রমণীয়, স্মরণীয় রথযাত্রার মধ্য দিয়ে। রথযাত্রা নিছকই একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান মাত্র নয়। এটি ভারতীয় মননের, হিন্দু দর্শনের এক অবিস্মরণীয় আত্মপ্রকাশ। রথযাত্রা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান একথা সত্য, কিন্তু এর মধ্য দিয়েই ধ্বনিত হয় সেই শাশ্বত সনাতন বাণী— এক তিনি, বহু হন। আবার বহুর অন্তিম পরিণতি সেই একই। এ যেন সেই সত্য, যা ব্যক্ত বিজ্ঞানীর অনুভবে— নদীর উৎপত্তি শিবের জটাজাল থেকে, দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর সেই নদী আবার ফিরে যায় সেই মহাদেবেরই চরণতলে। বাস্তবে বিশ্বে রথযাত্রার মতো উৎসবের নেই দ্বিতীয় উদাহরণ।

**ভগবানই আসেন ভক্তের কাছে**

ভক্তের ভগবান। স্বতঃসিদ্ধ এই কথা। ভক্তের দল অর্ঘ্য নিয়ে যান মন্দিরে। পূজা করেন ভগবানকে পাওয়ার জন্য। তাঁর সাযুজ্য লাভের জন্য। ভগবান কৃপা করেন। আর একথা সকলেরই জানা, ভক্তের কোনো জাত নেই। ভগবানের কাছে সকলেই সমান। তাই সাধারণ অবস্থায় ভক্তরা ভগবানের কাছে গেলেও কোনো কোনো সময় ভগবান নিজেই আসেন ভক্তের কাছে। মন্দিরের পূজার বেদি থেকে নেমে ভগবান মিশে যান ভক্তদের সঙ্গে। তাঁর সেই লীলারই এক অপরূপ প্রকাশ রথযাত্রা। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ায় শুরু হয় এই উৎসব, শেষ হয় সাতদিন বাদে শুক্লা দশমীতে বহুদাযাত্রা বা উলটোরথের দিনে।

রথযাত্রায় ভগবান বা বিগ্রহ গর্ভগৃহের পূজার বেদি থেকে নেমে সাধারণের মাঝখানে কেবল রথারূঢ় হন তা নয়, সেই রথ সচল হয় না তার রশিতে সব ধরনের মানুষের হাত যুক্ত

না হওয়া পর্যন্ত। কোনো বিশেষ হাত নয়, বর্ণ নয়, নয় ধনী বা নির্ধনের ভেদাভেদ, কেবল সমবেত কণ্ঠে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি বা মন্ত্রোচ্চারণের ঐকতানের সঙ্গে তাল মিলিয়েই শুরু হয় কালের যাত্রা— রথের চক্র হতে থাকে আবর্তিত। ভগবদ্‌লীলার এ এক অপরূপ প্রকাশ।

এতো গেল রথযাত্রার বহিরঙ্গের কথা। অন্তরঙ্গে ভগবান মাতেন আরেক লীলায়। শাস্ত্রের বচন, মানুষের হৃদয়েই থাকেন ঈশ্বর। থাকেন সুপ্ত ভাবে। মানুষ নিজেও ভুলে যায় তাঁর অন্তরস্থিত ওই ঈশ্বরের কথা। সেই বিস্মরণ থেকে স্মরণের সারণিতে ফিরিয়ে আনার জন্যই ভগবান মাতেন রথযাত্রার আনন্দে।

**এ এক প্রতীক**

ভারত-ধর্মের ইতিহাসে রথ— কেবলই একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। এ হলো একটি দর্শন। এ দর্শন যেন এক মহাসাগর। সে সাগরে এসে মিলেছে নানা নদীর মতোই অধ্যাত্ম দর্শন যার মধ্যে আছে পৌরাণিক ও লৌকিক দর্শনও। সব মিলিয়ে রথযাত্রার অনুষ্ঠান এক সমন্বয় দর্শনের প্রতিরূপ।

রথ একটি যান। বহনের জন্য ব্যবহৃত হয় ওই যান। ভারতীয় দর্শনে এই রথ হলো দেহের প্রতীক। সহজ কথায়— দেহরথ। কঠোপনিষদের ভাষায়— 'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু'— এ দেহরথ। সারথি তার বুদ্ধি, আরোহী হলেন জীবাত্মা। এর অশ্ব হলো ইন্দ্রিয়, মন হলো বলগা। এই মন আর ইন্দ্রিয়ের সাহচর্যেই সুখ ও দুঃখ ভোগ করে জীবাত্মা।

এই প্রতীকী রথ বহন করে জগন্নাথকে। বৈষ্ণব দার্শনিকদের অভিমত, ভগবানকে কেউ বহন করতে পারে না, তিনি নিজেই বহন করেন নিজেকে। কীভাবে? উত্তরে বলা হয় ভগবানের অন্তরঙ্গ বা স্বরূপ শক্তির কথা। সে শক্তি আবার ত্রিবেণীর মতোই ত্রিধা বিভক্ত— (১) হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি—যার প্রতীক শ্রীমতী রাধা, (২) সঙ্গিনী শক্তি বা অস্তিত্ব বিষয়ক শক্তি— নন্দ, যশোদা ও দেবকী হলেন এই শক্তির প্রকাশ, (৩) সংবিৎ বা সমগ্র জ্ঞান বাহক শক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বহন করে চলে সঙ্গিনী শক্তির অন্য নাম ধারণকারী শক্তি।

ভগবান কৃষ্ণ-বিষ্ণু বা জগন্নাথকে বহন করে বলেই জগন্নাথের রথ হলো ভগবানের সঙ্গিনী শক্তির আধার। এই সঙ্গিনী শক্তির যার অংশ হলো শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবানের কৃষ্ণসত্তার বিশ্রাম হয় এরই উপর। তাই রথে আসীন এই সময় তাঁকে দর্শন করলে ঘটে মুক্তি। ছিঁড়ে যায় পুনর্জন্মের বাঁধন। দর্শক হন পুনর্জন্ম রহিত।

**উৎস-সন্ধান**

এতো গেল রথযাত্রার দার্শনিক ব্যাখ্যা। কিন্তু কত প্রাচীন এই রথযাত্রা উৎসব? অথবা যান হিসেবে রথের ব্যবহার শুরু হয় কোন সময় থেকে? সঠিক ভাবে রথ উদ্ভাবনের সময় কাল জানা যায় না। তবে ঋগ্বেদে রথের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের নানা মন্ত্রে রথারোহী সূর্য, ইন্দ্র প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের ৮৫ সংখ্যক সূক্ত থেকে জানা যায়, সে সময় রথ তৈরি হতো শাল্মলী কাঠ দিয়ে। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ সংখ্যক সূক্তে রয়েছে খদির ও শিংশপা গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি হতো চাকাযুক্ত এই রথ। সে রথ যে অত্যন্ত দ্রুতগামী ছিল তা বোঝা যায় সরস্বতী নদীর রূপ বর্ণনায়। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সংখ্যক সূক্তে আছে

## মাহেশ-মহিষাদলের রথ

পুরীর পরেই সবচেয়ে বড়ো এবং প্রাচীন রথ হলো হুগলি জেলার মাহেশের। প্রায় সওয়া ছ'শো বছরের এই পুরনো ওই রথযাত্রার শুরু ১৩৯৬ সালে। ৫০ ফুট উঁচু, ১২৫ টন ওজনের লোহার রথটির চাকার সংখ্যা বারো। রথযাত্রার প্রবর্তক কমলাকর পিপলাই, পৃষ্ঠপোষক শ্যামনগরের বসুপরিবার। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মাহেশে একমাস ধরে চলে রথের মেলা।

মাহেশের মতোই পশ্চিমবঙ্গের আরেকটি বিখ্যাত রথ হলো পূর্বমেদিনীপুরের মহিষাদলের রথ। এই রথের কলস ও ধ্বজা-সহ উচ্চতা ৫০ ফুট। নবরত্ন মন্দিরের ধাঁচে তৈরি এই রথযাত্রার প্রবর্তন করেন মহিষাদলের রানি জানকীদেবী ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে।

সরস্বতী নদী রথের মতোই প্রশস্ত ও দ্রুতগামী।

এর থেকে স্পষ্ট সুপ্রাচীনকাল থেকেই যান হিসেবে রথের ব্যবহার হয়ে আসছে। সে সময় লৌকিক জীবনেও রথের অস্তিত্ব ছিল। রথ যে কেবল যাতায়াত বা যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হতো তা নয়। রথে দেববিগ্রহ বসিয়েও যে যাত্রা উৎসব পালিত হতো তারও নানা নজির রয়েছে। শিবের রথযাত্রা, সূর্যের রথযাত্রা, বুদ্ধের রথযাত্রা ইত্যাদির নানা উল্লেখ পাওয়া যায় নানা পুরাণ কথায়, বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণেও। তবে কবে থেকে ভগবান বিষ্ণুকে রথে বসিয়ে এ উৎসবের শুরু তা জানার জন্য নির্ভর করতে হয় নানা জনশ্রুতির ওপর।

**পুরাণকথা**

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতের বহু অর্চিত ও পালিত অনুষ্ঠান রথযাত্রা। অবশ্য রথযাত্রার কেন্দ্রেই থাকতেন না বিষ্ণু বা জগন্নাথদেব। ঠিক কবে থেকে জগন্নাথের রথযাত্রার সূচনা তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে পুরাণকথায় পাওয়া যায়, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। জগন্নাথের রথযাত্রার প্রবর্তকও তিনি।

ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুভক্ত। পুরী বা নীলাচলে তিনি বিষ্ণুর নীলমাধব মূর্তির মন্দির তৈরি করতে চান। নীলমাধবের খোঁজ দেন বিদ্যাপতি নামে এক ব্রাহ্মণ। জানান, নীলমাধবের মূর্তি রয়েছে গভীর জঙ্গলে শবররাজ বিশ্ববসুর কাছে। রাজা যান মূর্তি আনতে, কিন্তু পান না নীলমাধবকে।

এমন সময় দৈববাণী, 'ফিরে যাও রাজা। সমুদ্রে ভেসে আসবে একটি কাঠ। সেই কাঠ দিয়ে তৈরি করো বিগ্রহ।' এ যেন হতাশার অন্ধকারে আশার আলো। ফিরে যান রাজা। যান সমুদ্র তীরে।

সত্যিই ভেসে এল কাঠ। কিন্তু কাঠ যে লোহার চেয়েও শক্ত। কাঠ কাটতে ব্যর্থ হয় শিল্পীরা। সেই সময় আসেন বিশ্বকর্মা (নাকি, জগন্নাথ স্বয়ং)। বলেন, মূর্তি গড়ে দেবেন তিনি। একুশ দিনে। তবে শর্ত, মূর্তি গড়বেন বন্ধ ঘরে। সে সময় কেউ যেন দরজা না খোলে। খুললে সেই অবস্থায় মূর্তি রেখেই চলে যাবেন তিনি।

রাজা রাজি। শুরু হয় মূর্তি গড়ার কাজ। নির্দিষ্ট দিনের আগেই কৌতূহলী রানির আবদারে দরজা খোলেন রাজা। সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত শিল্পী। মূর্তির তখনও গড়া হয়নি হাত-পা। সেই অসম্পূর্ণ মূর্তি দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন রাজা ও রানি। স্বপ্নে রাজাকে বলেন জগন্নাথ, এই রূপেই পূজা নিতে চান তিনি। তাই হয়। পুরীর মন্দিরে ওই ভাবেই শুরু হয় জগন্নাথের পূজা। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নই প্রচলন করেন রথযাত্রার। দাদা বলরাম আর বোন সুভদ্রাকে নিয়ে সাতদিনের জন্য তিনি আসেন ইন্দ্রদ্যুম্নের রানি গুণ্ডিচার মন্দিরে রথে চড়ে। এ কাহিনি স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ইত্যাদির।

**আদিতে তিন নয়, ছয় রথ**

ওড়িশার রথযাত্রা 'পাহান্ডি উৎসব' নামে পরিচিত। ওড়িশার প্রাচীন পুঁথি 'উৎকল খণ্ড' এবং 'দেউলতোলা'-য় রথযাত্রার যে ইতিহাস পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায়, 'সত্যযুগে এই উৎসবের সূচনা, কাহিনি। দ্বারকায় সমুদ্রতীরে কৃষ্ণর মৃতদেহ সৎকারের সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা অসম্পূর্ণ হয়। অর্ধদগ্ধ দেহাংশ সমুদ্রে ভাসতে

## জগন্নাথদেবের সুনাবেশ

উলটো রথের পর বিগ্রহ মন্দিরে ফিরে এলে রথেই হয় প্রভুর বিশেষ অর্চনা। সাজানো হয় নানা স্বর্ণালংকারে। এটাকে বলা হয় জগন্নাথদেবের সুনাবেশ।

জনশ্রুতি ১৪৬০-এ রাজা কপিলেন্দ্রদেব বিভিন্ন যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসে সোনা নিবেদন করেন জগন্নাথকে। পরিমাণটা বিপুল। বর্তমানে জগন্নাথকে সুনাবেশে যে সোনার গয়না পরানো হয় তার ওজন ২০৮ কেজি।

ভাসতে উপকূলে পৌঁছায়। বিশ্ববসুর নেতৃত্বে একজন শবর জঙ্গলের গভীরে মন্দির তৈরি করে 'নীলমাধব' নামে তার পূজা করতে থাকে। এই নীলমাধবকে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দৈব নির্দেশে পুরীতে জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীক্ষেত্র পুরীর রথযাত্রা সম্পর্কে ষোড়শ শতকে প্রণীত 'মাদলা পঞ্জি' পঞ্জিকায় আছে, একসময় পুরীর জগন্নাথ মন্দির এবং গুণ্ডিচা মন্দিরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যেত নদী, নাম তার মালিনী। এরই অপর নাম বড়ো নাই বা বড়ো নদী। সে সময়ে রাজা বিগ্রহকে পুরীর মন্দির থেকে গুণ্ডিচা মন্দিরে আসার জন্য তৈরি করে ছ'টি রথ। প্রথম তিনটি রথে জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা বিগ্রহকে আনা হতো নদী পর্যন্ত। নদী পার হয়ে ওই তিন বিগ্রহকে চাপানো হতো অন্য তিনটি রথে, তাতে চেপেই পৌঁছতেন তাঁরা গুণ্ডিচা মন্দিরে।

রাজা বীর নরসিংহের রাজত্বকালে (১২৩৮-১৩৬৪) নদীটি মাটি দিয়ে ভরাট করা হয় এবং তারপর থেকেই রথযাত্রায় ব্যবহৃত হয় তিনটি রথ। তিন রথেই পুরী মন্দির থেকে গুণ্ডিচা বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ২৮ কিলোমিটার পথ রথযাত্রা অনুষ্ঠানের সূচনা ওই সময় থেকেই। নরসিংহদেবই গুণ্ডিচা মন্দিরটি পাথর দিয়ে গড়ে দেন। পুরীর এই রথযাত্রার শুরু কবে থেকে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না। তবে ত্রয়োদশ শতকেও যে পুরীর এই রথযাত্রা হতো তার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে।

'রথ চকড়' নামে যে গ্রন্থটি প্রাচীন মন্দিরে পাওয়া যায় তার থেকে জানা যায়, অষ্টম শতকে রাজা যযাতি কেশরী রথযাত্রা উদ্‌যাপন করেছিলেন।

**রথত্রয়ী**

রথযাত্রা সর্বভারতীয় উৎসব। কিন্তু আকারে, প্রকারে, প্রচারে সবকিছুতেই পুরীর রথযাত্রা সবচেয়ে বড়ো ও দেশখ্যাত। অন্যান্য সব জায়গার চেয়ে পুরীর রথযাত্রার রয়েছে স্বাতন্ত্র্য, রয়েছে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য। সে কারণেই রথযাত্রার সময় সারাদেশের মানুষের ঢল নামে পুরীতে। পুরীর রথযাত্রায় জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার জন্য রয়েছে তিনটি আলাদা আলাদা রথ। নামে-আকারে-রঙে এবং অন্যান্য সব কিছুতেই তিনটি রথের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে সকলের চোখে।

জগন্নাথদেবের রথের নাম নন্দীঘোষ। গরুড়ধ্বজ ও কপিধ্বজও এই রথের নামান্তর। তিনটি রথের মধ্যে উচ্চতায় সবচেয়ে বড়ো নন্দীঘোষ (৪৪'২')। রথের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান-সমান (৩৪'৬')। রথের চাকার সংখ্যা ষোলো এবং এটি তৈরি করতে লাগে ৮৩২টি কাঠের টুকরো। বিষ্ণুর বসনের রঙে রাঙানো রথের চূড়া লাল এবং হলদে উজ্জ্বল। রথের সারথি দারুক আর তত্ত্বাবধায়ক গরুড় আর পতাকা ত্রৈলোক্যমোহিনী)। রথে রয়েছে সাদা রঙের সাতটি ঘোড়া। তাদের নাম শঙ্খ, বহ্লক, শ্বেত, হরিদাশ, রচিকা, মচিকাজিতা, অপরাজিতা। একইভাবে রথের দড়ির নাম শঙ্খচূড় ও নাগিনী। সহযোগী বিগ্রহ মদনমোহন, দ্বারপাল জয় বিজয় আর বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতির প্রতিরূপে থাকেন যে ৯ জন পার্শ্বদেবতা— তাঁরা এলেন পঞ্চমুখী মহাবীর, হরিহর, মধুসূদন, গিরিধর, পাণ্ডু, চিন্তামণি, নারায়ণ, ছত্রভঙ্গরাবণ এবং হনুমানের উপরে উপবিষ্ট রাম।

একই ভাবে বলরামের রথের নাম তালধ্বজ বা লাঙলধ্বজ তার উচ্চতা ৪৩'৩', চাকা ১৪, তৈরিতে লাগে ৭৬৩টি কাঠের টুকরো, দৈর্ঘ্য প্রস্থ ৩৩'×৩৩', চূড়ার রং লাল ও নীলচে সবুজ, তত্ত্বাবধায়ক বাসুদেব, সাবহি, মাতলি। রথ টানে কালোরঙের চারটি ঘোড়া, সহযোগী দেবতা রাম ও কৃষ্ণ, দ্বারপাল নন্দ, সুনন্দ। রথে থাকেন গণেশ, কার্তিক, সর্বমঙ্গল ইত্যাদি ৯ জন পার্শ্বদেবতা।

দর্পদলন বা দেবদলন হলো সুভদ্রার রথের নাম। রথের উচ্চতা ৪২'৩', চাকার সংখ্যা ২২, কাঠ লাগে ৫.৯৩ টুকরো, রথের চূড়ার রং লাল কালো। তত্ত্বাবধায়ক জয়দুর্গা, সারথি অর্জুন, লাল রঙের চারটি ঘোড়া রথ টানে। সহযোগী বিগ্রহ সুদর্শন, দ্বারপাল গঙ্গা-যমুনা। থাকেন চণ্ডী, চামুণ্ডা, উগ্রতারা, বনদুর্গা, বারাহী, শ্যামাকালী, বিমলা প্রমুখ দেবী।

**অক্ষয় তৃতীয়ায় শুরু রথনির্মাণ**

পুরীর রথ তৈরি হয় প্রতি বছর। রথ নির্মাণ শুরুর নির্দিষ্ট দিন বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া। ওইদিন শুরু হয় হলকর্ষণ এবং কৃষির অন্যান্য কাজ। জগন্নাথদেবের তিন সপ্তাহব্যাপী চন্দনযাত্রাও শুরু ওইদিন থেকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের স্নানযাত্রা তারপর আষাঢ়ে শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা। বলা হয়, সুভদ্রার আবদার রাখতেই তিন ভাই-বোন রথে চেপে যাত্রা করেন মাসির বাড়ি গুণ্ডিচা মন্দিরে। কিন্তু যাওয়ার এক জায়গায় আপনা থেকেই থেমে যায় রথ কিছুক্ষণের জন্য। জগন্নাথ ভক্ত মুসলমান সালবেগ জীবনকালে দর্শন করতে পারেননি জগন্নাথকে। তাই প্রভু জগন্নাথ তাঁর ওই ভক্তের কবরের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পূরণ করেন ভক্তের মনের বাসনা।

**ভারত-ধর্মের প্রতীক**

রথযাত্র ভারত-ধর্মের এক অনন্য প্রতীক। এই উৎসব বিশ্বজনের উৎসব। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে ঘোষিত হয় শান্তি-সংহতি ও মৈত্রীর মহান বাণী।

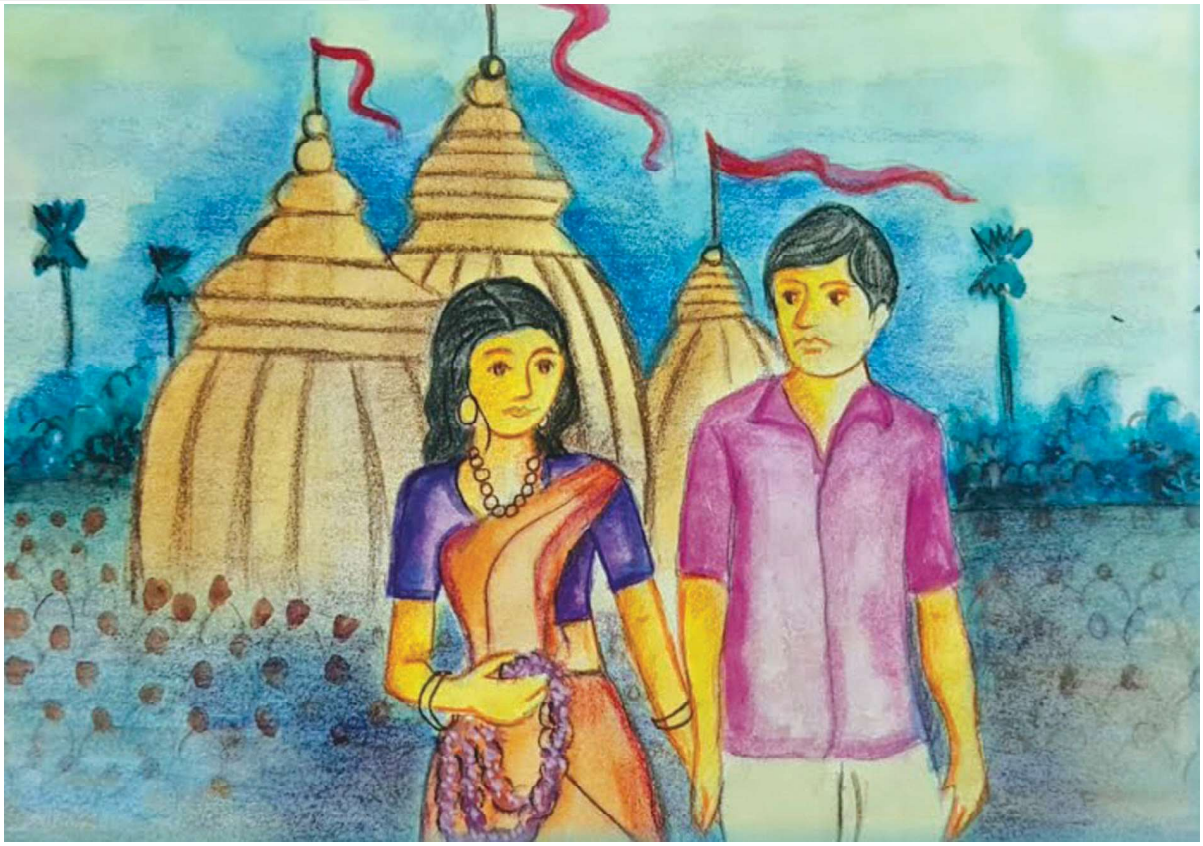

# রথের রজ্জু ও রাধারাণী

**ড. কল্যাণ চক্রবর্তী**

নতুন বারিধারায় জীবন তখন বিহ্বল। আসে রথযাত্রা; দেবত্বের অভিমুখে মানুষের চিরকালীন পথ চলা। রোজ রোজ পবিত্রতা আর নিত্য দিন পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার ঐশী-চর্যা শুরু হবার দিন। দুর্গাপূজার দিন গোনা, মূর্তির কাঠামো-পূজা, জীবনের কাঠামোর মধ্যে ধীরে ধীরে বাঁশ-খড়-মাটি লেপে ঐশী প্রলেপ বুলিয়ে জীবনকে দেবতার মতোই গড়ে তোলা। এই যাত্রা, এই কাঠামো, এই দেহযন্ত্রের ঐশী-বোধ, দেহরূপ মন্দির এবং জীবনের চিরন্তন-শকটের অন্তরালে আমাদের কতই না চিহ্ন-সংকেত! 'Each Soul is potentially divine.' আমাদের মধ্যেই জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার পরম উপস্থিতি! রথের রজ্জু টেনে ঐশী যাত্রাকে রমণীয় করে তোলা।

ছোটোবেলায় এক রথের দুপুরে 'রাধারাণী' উপন্যাসটি পড়েছিলাম। শ্রীরামপুরে রথের মেলা। রাধারাণীর মা ঘোরতর অসুস্থ। কাজেই পরিশ্রম-জনিত উপার্জন বন্ধ। আহার চলে না। মা রুগ্না, তাই উপবাস। রাধারাণীর আহার জুটলো না বলে উপবাস। রথের দিন মা একটু সুস্থ হলো। পথ্যের প্রয়োজন, কিন্তু পথ্য কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন, 'রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে। কিন্তু রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতেই বড়ো বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম— বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল— রাত্রি হইল— বড়ো অন্ধকার হইল— অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।'

রথের মেলায় গিয়ে বালিকা রাধারাণীদের আজও খুঁজি! তাদের কাছ থেকে সুগন্ধি মালা কিনবো। ওরা চাঁপা, রজনীগন্ধা, জুঁই ফুলের মালা নিয়ে আজও আসে গ্রাম-শহরের রথের মেলায়। মেলায় যে গরিব মানুষ গাছ বিক্রি করতে আসেন, তাদের প্রতি আলাদা একটা মমত্ব কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গের ফুলের হাটে-বাজারে এমন কত রাধারাণী! ফুল বিক্রি না হলে খালের জলে ফেলে দিয়ে আর্দ্র হৃদয়ে তারা বাড়ি ফেরেন। কারণ ফুলের হাটে উঠতি-পড়তির দোলা। এ রাজ্যে ফুল সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। বিক্রি না হওয়া ফুলকে প্রক্রিয়াকরণ করে রাখার পরিকাঠামো নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বহু বছর আগেই ফুলের বাজারের উঠতি-পড়তির দোলায় চড়েছেন, আজও তার সুরাহা হয়নি। 'রাধারাণী' উপন্যাসটির কালখণ্ড হচ্ছে ১২৮২ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ।

বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহদেবতা ছিলেন

রাধাবল্লভজী। রথযাত্রার দিনটি মহাসমারোহে পালিত হতো তাঁদের কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে। এই ঘটনার বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমশাই। দুজনের বাড়ি খুব বেশি দূরে ছিল না, নৈহাটি স্টেশন থেকে খুবই কাছাকাছি। রথের দিন বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহদেবতাকে বার করে ঘষেমেজে চকচকে করা হতো। বাড়ির দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটা মেলা হতো, প্রচুর পাকা কাঁঠাল, পাকা আনারস বিক্রি হতো। তেলেভাজা-পাঁপর- ফুলুরির গাদি লেগে যেত। আট-দশখানা বড়ো বড়ো ময়রার দোকান বসত— তাতে গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিহিদানা, মুড়িমুড়কি, মটরভাজা, চিঁড়েভাজা, ঘিয়ের খাজা যথেষ্ট থাকতো।

মেলায় মনোহারী দোকান থাকতো অনেকগুলো, তাতে নানারকম বাঁশি, কাগজের পুতুল, কাঠির উপর লাফ দেওয়া হনুমান, কটকটে ব্যাং কিনতে পাওয়া যেত। আর ছিল নানারকমের গাছের কলম। তখনকার দিনে চারা তৈরি ও বিকিকিনি কেমন ছিল, তা কাঁঠালপাড়া রথের মেলার প্রত্যক্ষদর্শী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিবরণে উঠে এসেছে। যারা বাগান করতে চান, যারা চারা কিনতে চান, যারা বাগানবিলাসী তাদের এক মহাসমারোহ ছিল নৈহাটির রথের মেলা। নারকেল, আম, লেবু, সুপারি, লকেট, গোলাপ জাম, পিচ, সবেদা, ফলসা, গোলাপ, জুঁই, জাতি, বেল, নবমালিকা, কামিনী, গন্ধরাজ, মুচকুন্দ, বক, কুরচ, কাঞ্চন, নগর, শিউলি প্রভৃতি ফল ও ফুলের চারা বিক্রি হতো। আট দিন ধরে চলতো এই মেলা। বসতো পুতুলনাচের আসর; সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীয়দমন প্রভৃতি চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের পুতুল নাচ হতো। রথে বহুলোকের সমারোহ ঘটতো। এই মেলার ভিড়েই একটি ছোটো মেয়ে হারিয়ে গেছিল ১৮৭৫ সালে। সেবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র রথের ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলেন। বাচ্চা মেয়েটির আত্মীয়স্বজনেরা বহু খোঁজ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও অনুসন্ধানে নেমেছিলেন, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। জানা যায়, এই ঘটনায় অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন বঙ্কিম। ঘটনার দুই মাস পরে 'রাধারাণী' উপন্যাসটি লেখেন বঙ্কিম। যদিও ঘটনার বিস্তার অন্যদিকে নিয়ে গেছেন তিনি। রথের মেলায় নানান ষড়যন্ত্রকারী মানুষের আনাগোনার খবর অনেক সময় শুনতে পাওয়া যায়, সে শহরেই হোক, অথবা নগরে, গ্রামে। মেয়ে মানুষের দিকে দূর থেকে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারার ঘটনাও সেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। হিন্দুধর্মের একটি উৎসব-মুখর দিনে যখন আনন্দ উচ্ছলতা চারিদিকে, তখন নানাভাবে অনুষ্ঠান পণ্ড করার, বিরক্ত করা মানুষ সুযোগ খোঁজে, লাভ-জেহাদের টোপে ফেলে। মানুষ ভয় পায়; নারী অপহরণ ও নারীপাচার চক্র পাছে অপকর্ম করে! তাই মেয়ে বালিকার হাত শক্ত করে ধরে রাখে। তারপরই আনন্দ করে রথের মেলায়। কারণ লাভ-জেহাদের ঘটনা অতীতে কম ঘটেনি তো! হিন্দু মেয়েরা সহজ আক্রমণের শিকার।

খুব ছোটোবেলায় রথের দিন দুপুরে আমার বাবা রহড়া বাজার থেকে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার মূর্তি কিনে আনতেন, রথে নবমূর্তি বসিয়ে টানা হবে। ঝুলনের সময় আসতো শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল মূর্তি, ঝুলন-স্কেপে সুন্দর করে ঝুলিয়ে দেবার জন্য। বাবা যখন কলেজে পড়তেন সেই সময় একবার রাজশাহী থেকে পুরী গিয়েছিলেন শ্রীমুখ দর্শন করতে। ঠাকুমা খুব ছোটোবেলায় বলেছিলেন, তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর গ্রামসুদ্ধ মানুষ বাবাকে দেখার জন্য এবং একটু মহাপ্রসাদ পাবার জন্য ছুটে এসেছিলেন। তখন ব্রিটিশ শাসনের শেষের দিক। নানাজন পুরীর মহাপ্রসাদ এনে দিলে তা পরম চিত্তে গ্রহণের পর খানিকটা কুলুঙ্গিতে তুলে রাখতেন ঠাকুমা। পরে দেখেছি, পুণ্যার্থী আত্মীয়স্বজন পুরী থেকে ফিরে মহাপ্রসাদ মায়ের হাতে দিলে, বাড়ির শিকেয় মাটির পাত্রে তুলে রাখা হতো। আমি একদানা করে খেতাম আর মনে মনে কল্পনা করতাম পুরীধাম থেকে ফিরে এসে বাবার অনুভূতির কথা। পরে জেনেছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে থাকবার ঘরটির দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রেখে দিতেন মহাপ্রসাদ, রোজ সকালে পরিচ্ছন্ন হয়ে একদানা করে মুখে দিতেন।

বাবা বলতেন, রথযাত্রা মানে হলো দেবত্বের অভিমুখে মানুষের চিরকালীন এগিয়ে যাওয়া। রোজ রোজ পবিত্রতা আর পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার ঐশী-জীবনচর্যা শুরু হয় রথের দিনটি থেকে। এই দিন থেকেই দুর্গাপূজার দিন গোনার শুরু, মূর্তির কাঠামো-পূজা। আমাদের মনুষ্য জীবনের কাঠামোর মধ্যেও ধীরে ধীরে বাঁশ, খড়, মাটির এক এক ঐশী-প্রলেপ বুলিয়ে বুলিয়ে জীবনকে দেবতার মতো করে গড়তে হয়। রথযাত্রা, দুর্গাকাঠামো, দেহযন্ত্রের ঐশী-বোধ, দেহ-রূপ মন্দির ও চিরন্তন-রথ-শকটের অন্তরালে কতই না কথা বলতেন বাবা! রথের দিন সকালে গীতাপাঠ করতেন, পাশে আসন নিয়ে বসতে বলতেন আমাদের, আমি বসতাম। তখন এতসব কথা বুঝতাম না। সেদিনের দুই-একটি কথা ও কৃত্য আজ স্মরণ করলে পুরোটাই কেমন ছবির মতো ভেসে ওঠে। বাবার অকাল প্রয়াণের পর যখন স্বামী বিবেকানন্দের ঐশীবাণীটি শুনলাম, 'Each Soul is potentially divine' তখন মনে হলো রথযাত্রার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাবা হয়তো এই কথাই বলেছিলেন।

রথের সাজসজ্জা করে দিতেন আমার দিদি (বড়দি) আর ছোড়দি; আমি আর ছোটোবোন চুপচাপ বসে বসে দেখতাম আর টুকটাক সাহায্য করতাম। বাহারি পাতার ডাল, কদম ফুল, কলাবতীর সৌকর্য, টগর ফুলের মালা দিয়ে দোতালা রথ সাজানো থাকতো। একটি ছোট্ট থালায় বাতাসা আর নকুলদানা। কেউ রথের রশি ধরে টানলে দুই একদানা এলাচদানা আর একটি বাতাসা দিতাম। অনেকে কয়েক আনা পয়সা দিতেন, তা দিয়ে ফেরার সময় জিলিপি আর পাঁপড় কেনা হতো। পুরো বিকেল আর সন্ধ্যাটা কতই না মনোরমভাবে কাটতো!

এরই মধ্যে মন উদাস হয়ে যেতো। তখন রহড়া-খড়দহ ছিল প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সবুজে ভরা— অসংখ্য পুকুর, তাতে শাপলা-কলমি-হিঞ্চে শাকের সমারোহে ডাহুক পাখির ডাক, মাঠের পাশে সন্ধ্যাদির বাড়িখানা কদমফুলের কেশরে ছেয়ে গেছে, জীবনবাবুর প্রাচীরের ধারে পুরনো অমলতাস গাছ হলুদ ফুলে ভর্তি, রাক্ষসী পুকুর পাড়ে কয়েকটি বহু পুরাতন কাঠচাঁপা গাছ, বিশ্বাসদের তালপুকুর আর বাঁশবন, কেয়া-কল্লোলদের উঠোনে তেজপাতা গাছের মহাসমারোহ, শীতলা বাড়ির পিছনে বুনো আঁশফলের গাছ, নমুদির উঠোনে রসকাটা খেজুর গাছ। এসব গাছ ফুলে-ফলে ভরে উঠলে মনটা খুশিতে ভরে উঠতো। রথ টানতে টানতে আপন মনে গাছের দিকে তাকাই, তারাও তাকায় একরাশ অব্যক্ত কথা নিয়ে। আজ রহড়ায় সেসব কিছুই নেই, চেনা রহড়ায় বড়ো বড়ো সব বাড়ি। যে বাড়িতে ভাড়া ছিলাম অনেকদিন, জমিটুকু কিনতেও সুযোগ দেওয়া হয়নি। ওখানে বেড়ে ওঠা আজকের ইমারত ছাড়িয়ে সেদিনের রথ সাজানোর ক্ষুদ্র বাসাটুকু অনেক বেশি অম্লান হয়ে ওঠে। টিনের চালে এক ইটে গাঁথা ঘর, বৃষ্টি ঝাপিয়ে এলে ঘরে বসেই টিন ছাপিয়ে জলের নরম সান্নিধ্য,; তার মধ্যে জগন্নাথ-বরলাম-সুভদ্রার পরম উপস্থিতি, বাবা বলতেন এখানেই চরমতম ঐশীশক্তি। বাবা অনেক সংগ্রামের পর শেষ প্রশ্বাসটুকু ওই শক্তি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। পূর্ণতার দিকে যাওয়ার পথে, জগন্নাথ যাত্রায়। ■

# শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের সার্ধশতবর্ষ শুভাবির্ভাব স্মরণোৎসব

গত ৩ জুন কলকাতার কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের সার্ধশতবর্ষ শুভাবির্ভাব স্মরণোৎসব সম্পন্ন হলো। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বৃন্দাবনের চৈতন্য কুঠীর শ্রীমৎ ফুলডোলবিহারী দাসজী মহারাজ। মঙ্গলাচরণ করেন রিষড়া প্রেমমন্দির আশ্রমের শ্রীমৎ ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী। নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করে তোলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. হরেকৃষ্ণ হালদার ও সম্প্রদায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহানাম সম্প্রদায়ের সম্পাদক (ভারত) শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী। মহানাম সম্প্রদায়ের সভাপতি (ভারত) শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী অনুষ্ঠানের মূল সুরটি বেঁধে দিয়ে বলেন, ব্রহ্মচর্য পালন, হরিনাম সংকীর্তন এবং জাতিভেদ প্রথার অবসানই ছিল প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের সাধনা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ এবং বেলডাঙ্গা শাখার সম্পাদক স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, কলকাতা মহামিলন মঠের সভাপতি কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ দাসজী, বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি শ্রীমৎ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ, কলকাতা শ্রীশ্রী অরবিন্দ ভবনের ট্রাস্টি বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়াস্থিত শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ধামের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ নরহরি দাস ব্রহ্মচারী, বাংলাদেশ শ্রীহট্টের শ্রীমৎ বন্ধুপ্রীতম ব্রহ্মচারী, ঢাকা মহাপ্রকাশ মঠের সহসভাপতি শ্রীমৎ নীলাদ্রিবন্ধু ব্রহ্মচারী, মায়াপুর ইসকনের শ্রীমৎ জগদার্তিহা দাস, নদীয়া আলাইপুরের শ্রীমৎ রাধাবিনোদ ঠাকুর গোস্বামী, প্রখ্যাত ভাগবত বক্তা শ্রীমৎ বৈষ্ণবপদ দাস বাবাজী, বরানগর শ্রীপাঠবাড়ি আশ্রমের শ্রীমৎ রমণদাস বাবাজী, হালিশহর অসম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের সম্পাদক স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু। উল্লেখ্য, হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি একমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সনাতন ধর্ম পালনের মাধ্যমেই ব্যক্তিগত ও বিশ্বের মঙ্গল সাধন সম্ভব বলে সকল বক্তাই উল্লেখ করেন।

মহানাম সম্প্রদায়ের সহ সম্পাদক শ্রীজ্যোতির্ময় গুহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

# নরেশ ভবনে সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের যোজনা বৈঠক

গত ২৮ মে কলকাতার নরেশ ভবনে সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের প্রথম যোজনা বৈঠক সম্পন্ন হলো। পাঁচটি জেলার কার্যকর্তরা এই বৈঠকে যোগ দেন। কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক কমলাকান্ত পাণ্ডে এবং সংগঠন সম্পাদক চন্দ্রশেখরজী অনলাইনে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বৈঠকে আগামীদিনের কার্যক্রম ও পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্ত, জেলা, প্রকোষ্ঠের পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করা হয়। ৪ জুন মুর্শিদাবাদ জেলার দ্বিতীয় পর্যায়ের যোজনা বৈঠক সম্পন্ন হয়।

# মধ্যবঙ্গ প্রান্তের উপার্জনশীল স্বয়ংসেবকদের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

গত ২৭ মে মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজারস্থিত তোষণিওয়াল সরস্বতী শিশুমন্দির প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের উপার্জনশীল স্বয়ংসেবকদের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। গত ৮ মে থেকে শুরু হওয়া এই বর্গে ১১২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল রাজীব কুমার শ্রীবাস্তব এবং বহরমপুর গার্লস কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. স্মৃতিরঞ্জন ত্রিপাঠী। প্রধান বক্তা রূপে' ছিলেন সঙ্ঘের মধবঙ্গ প্রান্তের বৌদ্ধিক প্রমুখ শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডল। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদ্বয় তাঁদের ভাষণে স্বয়ংসেবকদের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীমণ্ডল তাঁর ভাষণে গৌরবময় প্রাচীন ভারত, রাষ্ট্র নির্মাণে স্বয়ংসেবকদের ভূমিকা এবং বর্তমান সময়ের জ্বলন্ত সমস্যা ও তার নিবাকরণের বিষয়ে বিস্তৃত আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে নাগরিকদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিল।

# আলিপুরদুয়ারে প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্র প্রশিক্ষণ বর্গ

আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁ সংস্কার ভবনে সম্প্রতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুই দিবসীয় প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্র প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হলো। বর্গে ১৭ টি স্থান থেকে ৩১ জন আচার্যা প্রশিক্ষণ বর্গে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ প্রমুখ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিল্লি থেকে আগত বলরাম সিংহ। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রাণজ সংগঠন সম্পাদক অনুপ সওল, প্রান্ত সহ সভাপতি শ্যামজী শর্মা এবং আলিপুরদুয়ার জেলার সহ সম্পাদক অনিল আগরওয়াল।

# নন্দিতা বর্মনের স্মৃতির উদ্দেশে স্মরণসভা

গত ২৮ মে মাথাভাঙা সারদা বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উত্তরবঙ্গ কার্যবাহিকা প্রয়াত নন্দিতা বর্মনের স্মৃতির উদ্দেশে স্মরণসভা। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ সাধন কুমার পাল, কোচবিহার বিভাগ কার্যবাহ চন্দন কুণ্ডু-সহ বহু কার্যকর্তা। উপস্থিত সকলের চোখেই ছিল জল। এর থেকে প্রমাণ হয় একজন গৃহবধূ হয়েও সেবিকা সমিতির কাজের

মাধ্যমে কীভাবে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। বক্তাদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, ক্যানসার আক্রান্তা হয়েও কখনোই নিজের কষ্টের কথা বা পরিবারের সমস্যার কথা কাউকে বলতেন না। শুধু নিজের জেলায় নয়, উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় সেবিকা সমিতির কাজকে মজবুত করার জন্য নিজের পরিবার সামলে প্রচুর সময় দিতেন। লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোশহীন সংগ্রামী। বিশেষ করে ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের পর শীতলখুচি এলাকায় হিন্দু মা-বোনেদের উপরে যে নির্মম অত্যাচার শুরু হয়েছিল তার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষিকা ছিলেন। তাঁর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গ্রামের লোকেদের বক্তব্যে উঠে আসে, তিনি ওই গ্রামের কেন্দ্রে যোগ দেওয়ার পর গ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত মানের অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে। তাঁর জন্ম ১৯৬৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর এবং প্রয়াত হলেন ২০২৩-এর ২০ মে। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন তাঁর স্বামী ও অসংখ্য গুণমুগ্ধকে।

# শ্রীশ্রী জগন্নাথস্বামীর রথযাত্রার কথা

বুদ্ধ রথযাত্রা

**অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়**

'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে, ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে!'— কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে কৌরব-জননী গান্ধারী যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন করতে যান। যুদ্ধক্ষেত্রের চারপাশে অজস্র মৃতদেহ ও বীভৎস রক্তস্রোত দেখে ব্যথিত হয়ে পড়েন। আত্মীয়-স্বজনের মর্মান্তিক মৃত্যু দেখে ও নিজ পুত্রদের মৃত্যুতে শোকে গান্ধারী মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তাঁর ধারণা হয় শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিবারণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। তখন তিনি তীব্র মর্মযন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দেন যে তাঁরও অপঘাতে মৃত্যু হবে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৩৬ বছর পরে একদিন বনের মধ্যে জরা নামক এক ব্যাধ মৃগভ্রমে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে তিরবিদ্ধ করে। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু ঘটে। দাদা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে শোকাহত সুভদ্রা ও অর্জুন ছুটে গেলেন দ্বারকায়। বাহন ছিল রথ। সেই রথে দ্বারকায় পৌঁছে তীব্র শোক সহ্য করতে না পেরে সুভদ্রাও সমুদ্রতটে প্রাণত্যাগ করেন। দ্বারকা তখন পুরুষশূন্য, তাই তিন ভাই-বোনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেছিলেন অর্জুন। সমুদ্রের ঢেউ এসে চিতাকাঠ নিভিয়ে দেয়। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুযায়ী তিনটি অর্ধদগ্ধ নিমকাঠ অক্ষত নাভিস্থলগুলি জড়িয়ে তিনি প্রভাসে প্রেরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই দেহাবশেষ ভেসে যায় সমুদ্রে। মৃত্যুর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের আরও নির্দেশ ছিল, ভারতের একেবারে বিপরীত প্রান্তে নীলাচলের উপকূলে সেগুলি গ্রহণ করবেন শবররাজ বিশ্বাবসু, যিনি ছিলেন ঋষি মার্কণ্ডেয়-র পরে নীলাচলে দ্বিতীয় মানুষ। শবররাজ এই 'নীলমাধবরূপী' দেহাবশেষ পেয়ে নীলগিরি পর্বতে ঘন অরণ্যের এক নির্জনস্থানে এই নীলমাধবের উপাসনা করতে থাকেন। অবন্তীনগরের সূর্যবংশীয় রাজা, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উত্তরসূরি ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নাদেশ লাভ করেন। শ্রীভগবান তাঁকে জানান যে নীলমাধব রূপে তিনি অবস্থান করছেন। তিনি শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠা চান, কিন্তু রাজাকে খুঁজে বের করতে হবে তাঁর প্রভুকে। ইন্দ্রদ্যুম্ন দেশ-দেশান্তরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পাঠালেন। সকলেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। কেবল বিদ্যাপতি নামে এক ব্রাহ্মণ ফিরলেন না। অরণ্যে পথক্লান্ত বিদ্যাপতির সঙ্গে শবররাজ কন্যা ললিতার সাক্ষাৎ হলো। ললিতার শুশ্রূষায় মুগ্ধ বিদ্যাপতি শবর কন্যাকে বিবাহ করলেন। বিদ্যাপতি তাঁর শ্বশুর শবররাজের ইষ্টদেবতা নীলমাধবের সন্ধান পেলেন।

*বলরাম মন্দিরে রথযাত্রা*

সেই সংবাদ রাজাকে পৌঁছে দিতে রাজা শবররাজের কাছে নীলমাধবকে চাইলেন। বিশ্বাবসু তাঁর আরাধ্যকে রাজার হাতে তুলে দিতে চাননি। সৃষ্টি হয় এক যুদ্ধ পরিস্থিতির। দৈববাণী হলো : দেবতা স্বয়ং অরণ্য ছেড়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা পেতে চান। কিন্তু নীলমাধব রূপে নয়; দারুব্রহ্ম রূপেই তাঁর অর্চনা করতে হবে ইন্দ্রদ্যুম্নকে। অর্থাৎ ঈশ্বর স্বয়ং বৃক্ষরূপে প্রতিষ্ঠা চাইলেন। অর্থাৎ বৃক্ষই দেবতা, আর জগতের নাথ শ্রীশ্রী জগন্নাথস্বামীর নির্দেশে শবর জাতি হলো সেই ঈশ্বরের দয়িতা। মহাপ্রভু স্বয়ং অরণ্যের আদিম অধিবাসীদের নিজের প্রধান ভক্ত হিসেবে মান্যতা দিলেন। সকলেই পেলেন পূজার অধিকার। 'জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে'।।

স্নানযাত্রার পর অবসরকাল থেকে নবকলেবর

পর্যন্ত, রথযাত্রার আগে প্রভুর মহাপ্রসাদ রাঁধার অধিকার শবরদের। এই মহাপ্রসাদে সমস্ত আচণ্ডালের অধিকার আছে। স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী, দেবী গৌরী শ্রীবিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা জানান এমন ভোগ যেন তিনি পান, য কখনওই কোনো কারণেই বন্ধ না হয়। সেই ভোগ মহাপ্রসাদ যেন সকলে সমস্ত বছর ধরে পায়। পুরাণকথা অনুযায়ী, হরপ্রিয়া গৌরীর এই প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে শ্রীবিষ্ণু শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথধামে তাঁকে 'বিমলা' নামে প্রতিষ্ঠা দিলেন। কালিকাপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, পীঠ নির্ণয় তন্ত্র, তন্ত্রচূড়ামণি ইত্যাদি শাস্ত্র অনুযায়ী শ্রীক্ষেত্র, নীলাচলধাম হলো শক্তিপীঠ, মা সতীর নাভি পতনের স্থল। এই স্থানে মা দেবী বিমলা নামে পূজিতা। বিমলা মন্দিরে ভোগ অর্পণ করা হয় শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবকে। কথিত আছে, শ্রীক্ষেত্রে উপবাস নিষিদ্ধ।

**'রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি'**

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বোধিবৃক্ষের মূল থেকে কপিলাবস্তু পৌঁছলেন বোধিসত্ত্ব ভগবান বুদ্ধ। 'দিকে দিকে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে।' রাজনির্দেশে রাজন্যবর্গ এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন রাজসভায়। সিংহাসন থেকে নেমে এসে পুত্রকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন রাজা শুদ্ধোদন। সবাই হতবাক! এদিকে প্রভুর ফেরার সময় উপস্থিত। কিন্তু বাইরে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমিয়েছেন তাঁকে একবার দর্শনের আশায়। এত মানুষের মধ্যে দিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া কীভাবে সম্ভব? প্রজাবৎসল রাজা তৈরি করালেন এব 'মহাযান'। সেই রথারোহী হয়ে মহাপুরুষ এলেন রাজপথে। ভক্তরাই দিল রশি ধরে টান। চললো মহাযান, সঙ্গে জয়ধ্বনি— 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'। মূর্তি ছাড়া দেব উপাসনায় মনঃসংযোগ করা যায় কীভাবে? কালক্রমে বৌদ্ধদের মধ্যে জমতে থাকে বিভেদের মেঘ। কপিলাবস্তুর সেই মহাযানের কথা তারা ভুলতে পারেনি কিছুতেই। অবচেতনে রয়ে গিয়েছিল মহাযান বা রথের কথা।

তাই বৌদ্ধধর্ম বিভক্ত হওয়ার সময় মূর্তিপূজকরা নিজেদের ঘোষণা করল মহাযান সম্প্রদায়রূপে। প্রাচীনপন্থীরা রয়ে গেলেন হীনযানরূপে। শুরু হলো বুদ্ধপূর্ণিমায় বহু চক্রবিশিষ্ট মহাযানে বা রথে বুদ্ধমূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা। একে একে আরও কিছু দেব-দেবীর দেখা পাওয়া যেতে লাগল। প্রশ্ন হলো, রথযাত্রা জাতীয় উৎসবের স্বীকৃতি পেল কবে? কুষাণরাজ কণিষ্ক ছিলেন পরম বৌদ্ধ। তিনি পঞ্চম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির আয়োজন করলেন নিজ রাজসভায়। অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর অবশেষে সরকারি ভাবে বৌদ্ধধর্ম বিভাজিত হলো। সেই প্রথম প্রচলিত পালির বদলে সরকারি ভাষায় স্বীকৃতি পেল সংস্কৃত। রাজ ধর্ম হলো বৌদ্ধ ধর্ম, আর রাষ্ট্রীয় উৎসবের মর্যাদা পেল রথযাত্রা (বুদ্ধযাত্রা)। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী বহির্ভারতে,বিশেষ করে এশিয়ার বেশ কিছু দেশের মানুষের সঙ্গে রথের পরিচয় করিয়েছিলেন সম্রাট অশোক। এক সময় রথযাত্রা ছিল উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের জনপ্রিয়তম উৎসব। মধ্যযুগের শুরুর থেকেই দেখা দিল বিপর্যয়। দ্বাদশ শতকের তুর্কি আক্রমণ বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের দিক নির্দেশ করে। নালন্দা, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলা হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত।

পুরীতে একসময় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে কলিঙ্গরাজ ব্রহ্ম দত্ত দন্তপুরে বুদ্ধদেবের 'শ্বদন্তের' ওপর একটি মন্দির নির্মাণ করেন। ফার্গুসনের মতে, পুরীই সেই দন্তপুর। বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিরত্ন— বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ত্রিরত্ন— বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও সুভদ্রা। এই বিগ্রহ অসম্পূর্ণ- হস্তপদরহিত। কারণ শ্রীভগবান কলিযুগে তাঁর লীলানুযায়ী সব কিছুই অবলোকন করবেন এবং সবাইকে কর্ম অনুরূপ ফলপ্রদান করবেন। তিনি এই যুগে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করবেন না। পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ নীলমাধবরূপে ছিলেন জনজাতি শবররাজের গৃহদেবতা। জনজাতিদের বিশ্বাস অনুযায়ী— এই ত্রিমূর্তি-রাম্-মা, বিম্-ম ও সীতাবোই। রাম্-মা-পৃথিবী ও মাটি। বিম্-ম-আকাশ। সীতাবোই-অর্থ ও প্রাচুর্যের দেবী। পৃথিবী জুড়ে অখণ্ড সনাতন ধর্মের অভিন্ন সাংস্কৃতিক সত্তার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে এই রথ। সিন্ধুসভ্যতা থেকে সুদূর লাতিন আমেরিকার মায়া ও ইনকা সভ্যতায় বিচরণ করেছে রথ। মায়া সভ্যতা অঙ্কুরিত হয়েছিল গুয়াতেমালা থেকে এল সালভাডোর, মেক্সিকো পর্যন্ত। ইনকা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল পেরু থেকে ইকুয়েডর হয়ে চিলি পর্যন্ত আন্দিজ পর্বতমালার কোলে ছায়াঘেরা বিস্তীর্ণ এলাকায় যা মহাভারতের সমসাময়িক। সেই সময়কার গুহাচিত্র পাওয়া গেছে লালতুন, নাজতুলিজ-সহ প্রায় ৪০টি গুহায়। ইনকারা নিজেদের সূর্যের সন্তান মনে করতো। তাদের উপাস্য রথারোহী সূর্যদেবকে বহু গুহাচিত্রে রথযাত্রী রূপে দেখা যায়। দেখা যায় মায়ানদের বিভিন্ন দেবদেবীদেরও। যেমন— ইতজামনা, চাক, আ-মুন, আপুচ, চেল প্রমুখ, ঠিক যেমন বুদ্ধদেব বা জগন্নাথদেবের রথমূর্তি। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল মেসোপটেমিয়া থেকে নীল নদ, সিন্ধু নদের ধারা ছুঁয়ে যত প্রাচীন সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল, সর্বত্র সন্ধান পাওয়া যায় এই রথের। আসলে প্রাচীন এই সনাতন সভ্যতাগুলি যেন এক বিনিসুতোর মালা। সমাজবিদরা বলেন যে সভ্যতা কখনও হারায় না। ফিরে ফিরে আসে। কারণ তার বীজ থেকে যায়।

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্**

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পুরীধামে যেতে না পারলেও শ্রীশ্রী মা সারদাদেবী পুরীধামে শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্র নিয়ে গিয়ে

*আসরীয় সভ্যতায় রথ*

*বুদ্ধ পূর্ণিমাতে রথযাত্রা*

জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়েছিলেন। সূক্ষ্মদেহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে পটে, ঘটে, সর্বত্র বিদ্যমান— এ ঘটনা তাঁরও পরিচায়ক। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বমুখেই বলেছিলেন— 'আমিই পুরীর জগন্নাথদেব'। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) শ্রীমদর্শন গ্রন্থে লিখেছেন যে— 'তাই (শ্রীরামকৃষ্ণ) পুরীতে যেতেন না। বলেছিলেন, পুরী গেলে শরীর চলে যাবে ওই (মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের) উচ্চ মহাভাবে। উহা এ শরীর ধারণ করতে পারবে না। গয়াতেও যাননি এই জন্যে। বলতেন, শরীর চলে যাবে। ওখান থেকে এসেছিলেন কি না'। বাংলা ১৩৩২ সনের ফাল্গুন মাসে শ্রীশ্রী ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদিদি পুরীধামে এসেছিলেন ভক্ত বিপিনের সঙ্গে। কিন্তু মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। এসময় একদিন জগন্নাথ মন্দিরে এসে দেখলেন গর্ভগৃহে একটি বেদীতে জগন্নাথদেবের ঠিক ডানদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর বসে আছেন। লক্ষ্মীদিদি বললেন যে জগন্নাথকে দেখতে পাচ্ছি না, আমার মন খারাপ। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন— 'আমি সর্বদাই জগন্নাথে আছি, চিন্তা করো না'। আরেকদিন লক্ষ্মীদিদি ঠাকুরকে দেখতে না পেয়ে দুঃখিত ছিলেন, তখন তিনি জগন্নাথদেবের কণ্ঠস্বর শুনলেন— 'দুঃখ পেও না, তোমার রামকৃষ্ণ আর আমি একই'। স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজ ১৯১১ ও ১৯১৭ সালে পুরী আসেন। অসুস্থ শরীরেও তিনি বারংবার জগন্নাথ দর্শনে যেতেন। একদিন জগন্নাথ মন্দিরে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, দেখলেন শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যদিক দিয়ে নেমে আসছেন। সাধারণ পোশাক, গলায় ফুলমালা। মহারাজ ছুটে গেলেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাণ করলেন ঠাকুরকে। ঠাকুরের পাদপদ্ম যেই স্পর্শ করতে যাবেন অমনি আর ঠাকুরকে দেখতে পেলেন না। মহারাজ বলতেন, 'জগন্নাথদেবই শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন'। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'ক্রাইস্ট, চৈতন্য আর আমি এক'। ঠাকুরের আরেক অন্তরঙ্গ ত্যাগী পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ পুরীতে গিয়ে দেখলেন যে এক খ্রিস্টান পাদরি যিশুর কথা প্রচার করছেন। জগন্নাথদেবের মন্দিরে হরিনাম সংকীর্তন হওয়া উচিত চিন্তা করে তিনি খোল-করতাল জোগাড় করে হরিনামে মাতলেন ও বহু মানুষ তাতে যোগ দেওয়ায় খ্রিস্টান পাদরিদের সভা ভেঙে যায়। সেই দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পান মহারাজ। ঠাকুর বললেন, 'তুই ওদের তাড়াতে গেলি কেন? ওরা তো আমার নামই করছিল রে'। মহারাজ তার পরের দিন খুঁজে বের করলেন সেই পাদরিকে ও আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইলেন। শাস্ত্রবাক্য— 'রথে চ বামনং দৃষ্টা, পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম গৃহীভক্ত শ্রীবলরাম বসুর বাড়িতে জগন্নাথদেবের নিত্যসেবা ছিল। বলরাম-মন্দিরে রথোৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুরের যোগদান এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ভক্তদের অবিরত নাম— সংকীর্তনের মধ্যে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণও বলরাম ভবনে আনন্দ- বিভোর। পার্ষদ সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবঘন আনন্দময় মূর্তি সেই সংকীর্তন মাঝে যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরা ধন্য। শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির রচয়িতা অক্ষয় কুমার সেন লিখেছেন—

'অতিশয় ক্ষুদ্র রথ কাঠের নির্মিত
দ্বিতলের বারান্দায় টানিবার মতো।'

তারপর রথের মধ্যে বিগ্রহগুলি যথাস্থানে রাখা হলো। ভক্তবৃন্দের ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি রথের প্রতি নিবদ্ধ হওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণ রথের রজ্জু ধরে টানলেন। স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের বর্ণনা অনুযায়ী— 'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা ছিল, কাজেই রথের সময় রথটানাও হইত, কিন্তু সকলই ভক্তির ব্যপার, বাহিরের আড়ম্বর কিছুই নাই। ছোটো একখানি রথ, বাহির বাটির দোতলায় চক-মিলানো বারান্দায়। চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টানা হইত— একদল কীর্তনীয়া আসিত, ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণ ওই কীর্তনে যোগদান করিতেন।' বলরাম বসুর বাড়ির এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে যে ভগবদ্ভক্তির প্লাবন বয়ে যেত, তাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সশরীরে আবির্ভাবে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকেই যেন দর্শন করতেন উপস্থিত ভক্তেরা।

আন্দিজ পর্বতমালার গুহাচিত্রে রথ

*মেসোপটেমীয় সভ্যতায় রথ*

*সাহারায় মরু সভ্যতার রথের চিত্র*

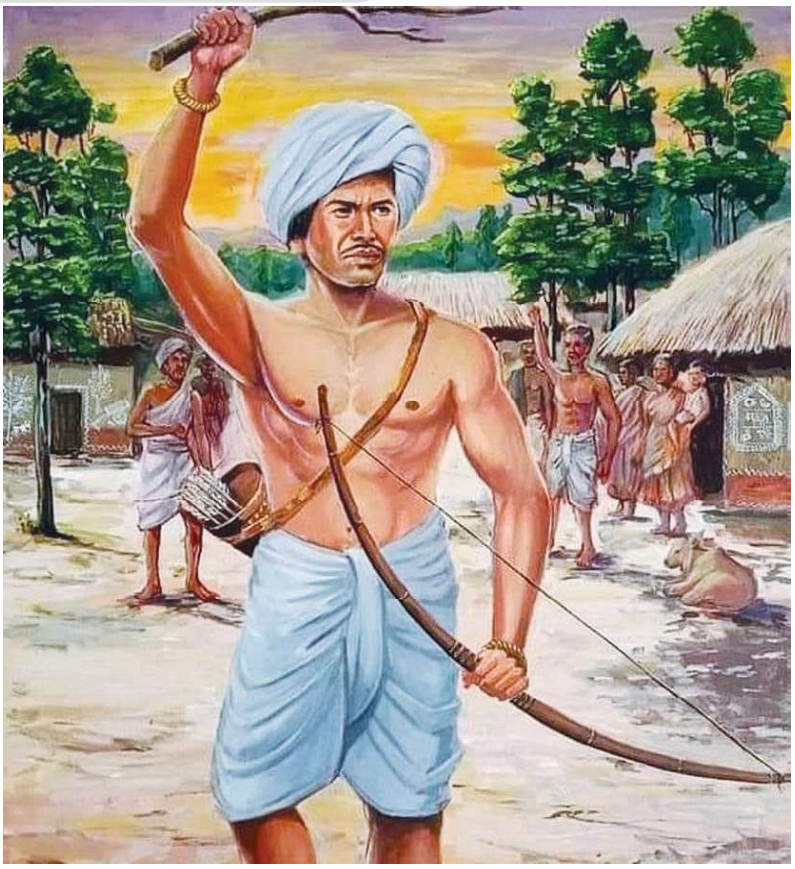

# জনজাতি মহানায়ক
# ভগবান বীরসা মুণ্ডা

অধুনা ঝাড়খণ্ডের জনজাতি দম্পতি সুগনা ও করমী মুণ্ডার ঘরে ১৮৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর বীরসা মুণ্ডা জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় ইতিহাসে বীরসা মুণ্ডা এমন এক ঐতিহাসিক নায়ক যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তার দ্বারা জনজাতি সমাজের তৎকালীন পরিস্থিতি ও অবস্থানকে পরিবর্তন করে আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক যুগের সূত্রপাত করেন। অদম্য প্রয়াসের প্রতি পৃষ্ঠায় তিনি শৌর্যের শব্দাবলী রচনা করে গেছেন।

বীরসা মুণ্ডা অনুভব করেন যে আচারবিচার সর্বস্ব এই জনজাতি সমাজ অন্ধবিশ্বাসের প্রলয় ঝড়ে সম্পূর্ণ দিশাহীন। বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথা জনজাতি সমাজের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশকে রুদ্ধ করেছে। জমিদার, জায়গিরদার ও ব্রিটিশ শাসনে জনজাতি সমাজ হচ্ছিল অত্যাচারিত। জনজাতি সমাজকে এই নির্যাতন হতে মুক্তি দেওয়ার জন্য বীরসা মুণ্ডা তাদের তিনটি স্তরে সংগঠিত করার প্রয়োজন অনুভব করেন। প্রথমটি সামাজিক স্তরে, যাতে জনজাতি সমাজ অন্ধবিশ্বাসের জাল ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে। তিনি জনজাতিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাঠ দিলেন। তাদের শিক্ষার গুরুত্ব বোঝালেন। পারস্পরিক সহায়তা ও সমবায়ের পথ তিনি তাদের দেখালেন।

জনজাতি সমাজে এই ব্যাপক জাগরণের ফলে জমিদার, জায়গিরদার ও ব্রিটিশ শাসককুল হয়ে পড়ে আশঙ্কিত। ওঝা, গুণিনদের ঝাঁপ হয় বন্ধ। এরা সবাই একজোট হয়ে বীরসা মুণ্ডার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বর্বর ব্রিটিশরাজের কালাকানুনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানান বীরসা মুণ্ডা। সামাজিক স্তরে তিনি খুব প্রভাবশালী ছিলেন। জমিদার ও জায়গিরদারদের আর্থিক শোষণের হাত থেকে জনজাতি সমাজকে মুক্ত করার জন্য তিনি আর্থিক সংস্কারের কাজ শুরু করেন।

সামাজিক স্তরে জাগরণের সূচনার ফলে এই আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে জনজাতি সমাজ নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে জনজাতিরা 'বেগারি প্রথার' বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। এর পরিণামে জমিদার ও জায়গিরদারদের ঘরে, চাষের জমিতে ও বনভূমিতে কাজকর্ম হয়ে যায় বন্ধ।

সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে জনজাতি সমাজে চেতনার স্ফুলিঙ্গ সঞ্চারিত হওয়ার পরে রাজনৈতিক স্তরে জনজাতি সমাজ সংগঠিত হতে শুরু করলে সেই স্ফুলিঙ্গ যেন দাবানলে পরিণত হয়। নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে জনজাতি সমাজ হয়ে ওঠে সচেতন। জনজাতি সমাজের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল— গোমাতার সেবা করো এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়াভাব রাখো। কোনোরকম নেশা করো না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকো, ঘরে তুলসীগাছ লাগাও। বড়োদের সম্মান করো। কুসঙ্গে পড়ো না। খ্রিস্টানদের মোহজালে পড়বে না। নিজের ধর্ম পালন করো। নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি ও পরম্পরার প্রতি আস্থা রাখো। নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি কখনো ভুলবে না। সঙ্ঘবদ্ধ থাকো, নিজেদের মধ্যে কলহ করবে না। প্রতি বৃহস্পতিবার ভগবানের পূজা করো, ওইদিনে লাঙল চালাবে না।

পরাক্রম ও সামাজিক জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের বিচারে সেই যুগে বীরসা মুণ্ডা যেন হয়ে ওঠেন একাধারে একলব্য ও স্বামী বিবেকানন্দ। বীরসা মুণ্ডা বরেণ্য দেশপ্রেমিকদের অন্যতম। তাঁর থেকে বিপদের আশঙ্কা করে ব্রিটিশ প্রশাসন বীরসা মুণ্ডাকে গ্রেপ্তার ও জেলবন্দি করে। জেলে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হলে ৯ জুন, ১৯০০ বীরসা মুণ্ডা বীরগতিপ্রাপ্ত হন। □

# পশ্চিমবঙ্গ কীভাবে পুরোনো গরিমায় ফিরে এসে সুদিন ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হবে ?

**সুদীপ্ত গুহ**

আমরা বিভিন্ন আলোচনায় গত পাঁচ দশকের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেছি। কিন্তু আগামী দিনে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেই বিষয়ে খুব একটা আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায় না। অনেকেই আশা ছেড়ে দিয়েছেন। রাজ্য ও দেশ ছেড়েছেন বহু মানুষ। যারা থেকে গেছেন তারা আপোশ করেছেন জীবন ও জীবিকার জন্যে। সরকারি কর্মী হোক, আর বেসরকারি, রাজ্যের কর্মচারীদের বেতন অন্য যে কোনো রাজ্যের থেকে কম। মানুষ ধরেই নিয়েছেন মুম্বই,দিল্লি বা চেন্নাইয়ের থেকে কম বেতন পাওয়া তার জন্মগত অধিকার। পরিবেশ নেই ব্যবসার। পেমেন্ট না পাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। কয়েক লক্ষ মানুষ পেমেন্ট না পেয়ে ভিখারি হয়ে গেছেন। রাজ্যের একটা বড় অংশের মানুষ আজ রাজনৈতিক নেতাদের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহে বেঁচে আছেন। হয় ১০০ দিনের কাজ, নয় সিন্ডিকেট। কারণ বাঙ্গালি অতীত ভুলে বিশ্বাস করা শুরু করেছে, বাঙ্গালির পক্ষে ব্যবসা অসম্ভব। সংকট এমন জায়গায় যে বাঙ্গালির ওপরেই ভরসা ছেড়ে দিয়েছে বাঙ্গালি। বাঙ্গালি ডাক্তার অপারেশন করতে বললেন, বাঙ্গালি রুগি ভেলোরের ডাক্তারের কাছে দ্বিতীয়বার দেখিয়ে আসেন। যাঁরা যেতে পারেন না, তাঁদের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণই একমাত্র পথ। বাঙ্গালী বিশ্বাস করে পড়াশোনা করতে গেলে দিল্লি,কোটা, হায়দ্রাবাদ বা ব্যাঙ্গালোর পাড়ি দিতে হয়। আর কিছু বাঙ্গালি মনে করে ড্রপ আউটই একমাত্র ভবিতব্য।

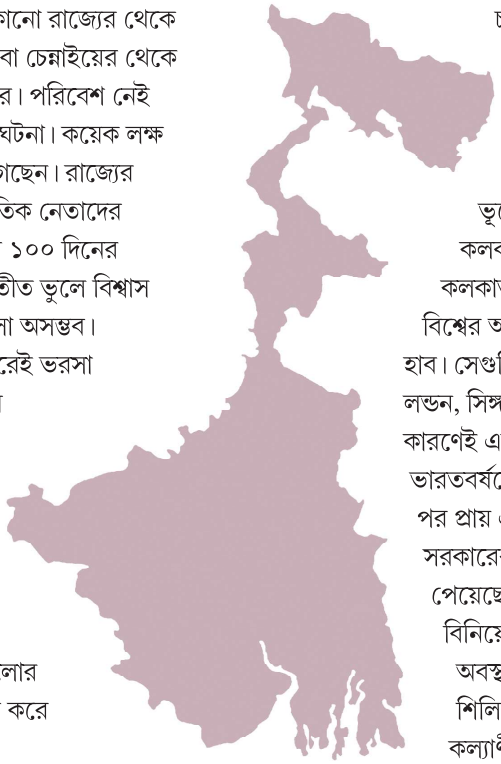

অথচ পুরো গঙ্গা অববাহিকার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের দ্বার আজও এই পশ্চিমবঙ্গই। দেশভাগের পর অর্ধেক বঙ্গভূমি অন্য বিদেশ হয়ে যাওয়ার পর উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড কোন পথে সুলভে তাদের উৎপাদিত বস্তু রপ্তানি করবে? চট্টগ্রাম বন্দর ভারতের বাইরে চলে যাবার পর স্থলবেষ্টিত (Landlocked) উত্তর-পূর্ব ভারতের নিকটতম দেশীয় বন্দর তো কলকাতাই। সেই পশ্চিমবঙ্গ যদি বিপথগামী হয়, দেশের অর্ধেক মানুষ কীভাবে দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে? তাই পশ্চিমবঙ্গকে আত্মনির্ভর হতেই হবে।

এবার পশ্চিমবঙ্গকে কীভাবে 'আত্মনির্ভর' পশ্চিমবঙ্গে পরিণত করা যায়, তার সম্ভাব্য উপায় বিশ্লেষণ করা যাক। এই বিশ্লেষণের আগে একটা কথা বলে নিই,এখানে সেই সেই ক্ষেত্র ধরা হয়েছে, যেখানে কাজ করতে কলকাতার ঘটি-বাঙ্গাল থেকে কুর্মি-রাজবংশী সবার চরিত্রের সঙ্গে মানানসই হয়। যেমন সেক্টর ৬ তথা বানতলা চর্মনগরী আপামর বাঙ্গালির চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। কিংবা বাজি তথা বোমা ক্লাস্টার একটা জাতির ভবিষ্যৎ হতে পারে না। তাহলে কোন সেক্টর আমরা বাছবো? বিশ্লেষণের প্রথমে কলকাতার ভূগোল ও ইতিহাসে নজর দেওয়া যাক। কলকাতার অবস্থানে একটা জাদু আছে। কলকাতার অবস্থানের সঙ্গে তুলনীয় শুধুমাত্র বিশ্বের অত্যন্ত সফল মহানগর তথা বাণিজ্য হাব। সেগুলি হলো লস এঞ্জেলস, নিউইয়র্ক, লন্ডন, সিঙ্গাপুর, দুবাই ও মুম্বাই। ঠিক সেই কারণেই একসময় ব্রিটিশরা কলকাতাকে ভারতবর্ষকে রাজধানী বানিয়েছিল। স্বাধীনতার পর প্রায় এক দশক ভারত সরকার ব্রিটিশ সরকারের কাছে যে ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছে, তার একটা বড়ো অংশ পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করেছে এর ভৌগোলিক অবস্থানের কথা কথা ভেবেই। তৈরি হয় শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, খড়্গপুর, হলদিয়া, কল্যাণী, সল্টলেক। দেশের প্রথম আইআইটি, প্রথম আইআইএম এবং পরবর্তীকালে প্রথম মেট্রো রেল পায় পশ্চিমবঙ্গই। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে দু'বার আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেছে আমাদের দেশ। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় যখন ১৯৬৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী দেশে পুরোপুরি সোভিয়েত মডেল চালু করলেন। ব্রিটিশ ও মার্কিন শিল্পপতিরা কলকাতা ছেড়ে সিঙ্গাপুর, কেনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া বা ইন্দোনেশিয়া চলে যায়। সেই সময় মালেশিয়া থেকে সদ্য বিচ্ছিন্ন হওয়া সিঙ্গাপুরের কাছে এ ছিল এক সুবর্ণসুযোগ। পরের কয়েক

বছরে সিঙ্গাপুর একটা লজিস্টিকস (multimodal logistics hub) ও ফিনান্সিয়াল হাবে পরিণত হয়। যাকে বলে পুরোদস্তুর এক বিজনেস হাব, স্বাভাবিক ছন্দেই, এরপর একে একে আসে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন শিল্প-সহ বাকিরা। এবং অবশ্যই উচ্চ প্রযুক্তি। অন্যদিকে, কলকাতা পরিণত হয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং পরিযায়ী শ্রমিক সরবরাহের হাবে। ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায় এখানকার শিক্ষা,স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (MSME), কৃষি, সংস্কৃতি (সাহিত্য, কবিতা, নাটক, যাত্রা, থিয়েটার, গান, চলচ্চিত্র) এবং সর্বোপরি একটা সুন্দর সমাজ।

কিন্তু রাজ্যকে বাঁচাতে প্রথমে কী চাই? প্রথম, শাসকের রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং আত্মবিশ্বাস, দ্বিতীয়, কয়েক ডজন আর্থিক, প্রশাসনিক এবং আইনি সংস্কার। তারপর তৃতীয় ধাপে চাই তিনটি হাব, যারা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অন্ধের মতো বাম কিংবা দক্ষিণপন্থা গ্রহণ করলে হবে না। হাবগুলি কী কী?

এক, লজিস্টিকস হাব : এটা এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে একটি পরিকল্পনামাফিক গভীর সমুদ্র বন্দর (যেমন সিঙ্গাপুরের জুরং বন্দর), একটি নিকটবর্তী তিন/চার-রানওয়ে বিশিষ্ট আধুনিক বিমানবন্দর, কিছু সংযোগকারী নদীবন্দর, জলপথ (সমুদ্রবন্দর থেকে নদীবন্দর গুলি পর্যন্ত সুলভে পণ্য পরিবহণ), পণ্য পরিবহণ রেলপথ (Dedicated Freight Corridor), যাত্রীবাহী রেলপথ ও সড়কের (Express Highway) সমাহার থাকবে। সঙ্গে থাকবে, উচ্চপ্রযুক্তির কোল্ডস্টোরেজ ও প্যাকেজিং পরিকাঠামো। একবার পরিকাঠামো তৈরি হলে, অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই আসবে জাহাজ, রেল লোকোমোটিভ, অটোমোবাইল ও বিমান কারখানা। তাঁর সঙ্গে আসবে হাজার হাজার ম্যানুফ্যাকচারিং ও মেইনটেন্যান্স-মূলক MSME শিল্প।

দুই, প্রয়োজন প্রযুক্তি হাব। যেমন ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, পুনে বা গুরগাঁও। আমাদের আগের প্রজন্মের নেতিবাচক, আধাবিপ্লবী চরিত্র কলকাতার প্রযুক্তি হাব হওয়ার পথে মূল অন্তরায় ছিল। অথচ, কম্পিউটারের অন্যতম পথপ্রদর্শক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট বরাহনগর থাকতে আমাদের 0 শতাংশ কম্পিউটার কর্মী আজ পরিযায়ী। প্রয়োজন সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন এবং দ্রুতগামী ইন্টারনেট। কলকাতাকে উচ্চপ্রযুক্তির নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। সঙ্গে গবেষণা।

তিন, ফিনান্সিয়াল হাব : এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে এক ছাতার তলায় অর্থাৎ ক্যাম্পাসে, সবকটি দেশি-বিদেশি, সরকারি- বেসরকারি ব্যাঙ্ক, নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট, স্টক মার্কেট, শেয়ার ব্রোকার কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি, বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল রেগুলেটরি অথরিটি ও ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থাকবে। ভারতে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে এই হাব বর্তমান। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও চেষ্টা করেছিলেন নিউটাউনে। কিন্তু লজিস্টিক হাব ও প্রযুক্তি হাব হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ নিজেকে সঠিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারায় কলকাতার নিউটাউনের ফিনান্সিয়াল হাব পরবর্তীকালে দাঁড় করানো যায়নি। এখন নিউটাউন ফিনান্সিয়াল হবে একটি ম্যাডাম ওয়াক্স মিউজিয়াম শোভা পাচ্ছে। উপরন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের একত্রীকরণের ফলে তাদের কারও সদর দপ্তর কলকাতায় নেই। বন্ধন ব্যাংক আজকের দিনে একমাত্র স্টক এক্সচেঞ্জ লিস্টেড ব্যাংক যার সদর দপ্তর কলকাতায়। যেখানে ইতিহাস বলে, ব্যাংক অব বেঙ্গল থেকেই স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার জন্ম। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রয়োজন।

একটা (SWOT) বিশ্লেষণ করাই যাক কলকাতার সম্ভাবনাকে ঘিরে। দেখা যাক ২০২৩-ও আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে।

শক্তি ঃ

(১) কলকাতার ভৌগোলিক অবস্থান লজিস্টিক হাব হবার পক্ষে আদর্শ। জলপথ (গঙ্গা তথা NW-1), রেলপথ (পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্বরেল), কলকাতা বিমানবন্দর এখানকার জন্য স্বাভাবিক সুযোগ এনে দিয়েছে। এই ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধা ভারতের আর কোনো শহরে নেই। তবে তা পর্যাপ্ত নয়। সড়ক যোগাযোগে এখনো পিছিয়ে। মালগাড়ি তথা ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর সরাসরি বন্দর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। বিমানবন্দরে অন্তত তিন/চার রানওয়ে প্রয়োজন। কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন গভীরসমুদ্র বন্দর।

(২) এত অধঃপতনের পরও ২০১১ সালে কলকাতার জিডিপি ($150 বিলিয়ন) হায়দরাবাদ ($76 বিলিয়ন) ও ব্যাঙ্গালোরের ($84 বিলিয়ন) মোট জিডিপির সমান ছিল। কারণ কলকাতার বিপুল ট্রেডিং। লন্ডন, নিউইয়র্ক, সিঙ্গাপুর, মুম্বাই বা দুবাইয়ের মতো ট্রেডিং হাব হবার সমস্ত সুযোগ এখনো কলকাতার আছে।

(৩) বস্ত্রশিল্প, রত্নশিল্প, স্বর্ণশিল্প, জরিশিল্প ইত্যাদির সেরা কারিগর বাঙ্গালি। কিন্তু এর ফল ভোগ করছে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু। সারা বিশ্বের বাজার ধরার ক্ষমতা বাঙ্গালির আছে। শুধু বিনিয়োগ এবং তার পরিবেশ প্রয়োজন। সঙ্গে প্রয়োজন কিছু আইনের পরিবর্তন। মণিকাঞ্চন, জরি পার্ক, বস্ত্র পার্কের মতো আরও SEZ চাই এই ধরনের শিল্পে MSME বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য।

(৪) রিলায়েন্স কোম্পানি বাংলাদেশে নিজের লোক বসিয়ে বস্ত্র উৎপাদন করিয়ে সারা পৃথিবীতে বিক্রি করছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গ নয় কেন? আবার সেই পরিবেশ। বস্ত্রশিল্পে বড়ো বিনিয়োগের বিরাট সম্ভাবনা আছে এই রাজ্যে।

(৫) পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের খনি এই রাজ্যকে বহুদিন সুযোগ করে দিয়েছে। কলকাতা খনি প্রযুক্তিতে (Mining Engineering) দেশের রাজধানী। কিন্তু মাশুল সমীকরণ ৩০ বছর আগে অবলুপ্ত হলেও তার সদ্ব্যবহারে আমরা ব্যর্থ। কারণ মাফিয়াতন্ত্র ও রাজনীতি।

(৬) অতিরিক্ত জল সম্পদ এই রাজ্যকে অতিরিক্ত সুবিধা দিয়েছে। আগেই

বলা হয়েছে, কলকাতাকে বাঁচাতে ভারত সরকার দুবার আন্তর্জাতিক আইন ভেঙে জল নিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই জল এখনো আমরা ব্যবহার করিনি। না সেচে, না পানীয় হিসেবে, না শিল্পে বা বাণিজ্যে।

(৭) চা-বাগান ঠিকমতো ব্যবহার করলে পশ্চিমবঙ্গ সারা বিশ্বের বাজার ধরতে পারে। উন্নতমানের দার্জিলিং চা নিজেই একটি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড।

(৮) দেশের দুটি বৃহৎ কর্মসংস্থানমূলক তথা শিল্প আইটি এবং পরিকাঠামোতে যে প্রযুক্তিবিদরা কাজ করেন তাদের অধিকাংশ মূলত বাঙ্গালি। কিন্তু তারা পরিষেবা দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। ইনফোসিসের প্রাক্তন কর্ণধার মোহনদাস পাইয়ের মতে পশ্চিমবঙ্গের মানব সম্পদ ব্যাঙ্গালোরের কাছে সুবর্ণসুযোগ এনে দিয়েছে নব্বইয়ের দশক থেকেই। এদের রাজ্যে ফিরে আসার পরিবেশ তৈরি হলে, এই দুই শিল্পই রাজ্যের রেকার সমস্যা সমাধান করে দিতে পারে।

(৯) চীনের ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলি তাদের নতুন গন্তব্য খুঁজছে। তাদের জন্য ভৌগোলিকভাবে কলকাতা সেরা জায়গা। কিন্তু জমি, SEZ এবং বন্দর পরিকাঠমোর পরিবর্তন করতে হবে। উত্তরপ্রদেশ ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়ে গেছে।

(১০) দেশের ও বিশ্বের কিছু সেরা শিক্ষা গবেষণাকেন্দ্র এই রাজ্যে আবস্থিত। যেমন IIT, IIM, ISI, IISER, IIEST, JU, CU, SINP, IACS, IICB, VECC ইত্যাদি।

(১১) মেডিক্যাল পর্যটন হাব হতে পারে এই রাজ্য।

দুর্বলতা ঃ

● ৪৩ বছরের নিরবচ্ছিন্ন মেধা পাচার (Brain Drain)।

● রাজ্যের বহদিনের নেতিবাচক কমিউনিস্ট ভাবমূর্তি।

● রাজ্যের পুনর্বাসন নীতির (R & R Policy) অভাব।

● কিছু পুরনো আইন যেমন জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন, কৃষি বিপণন আইন ইত্যাদি রাজ্যের কৃষি উন্নতির সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা।

● রাজ্যের SEZ নীতি।

● রাজ্যের FDI বিরোধী অতীত।

● অন্যান্য মহানগরীর তুলনায় কলকাতা ও শহরতলির পরিবহণ ও প্রযুক্তি পরিকাঠামোয় পিছিয়ে থাকা।

● রাজ্যের অসমাপ্ত সড়ক, বিমান, জলপথ ও বন্দর পরিকাঠামো প্রকল্প।

● জনঘনত্ব।

● শিক্ষা, স্বাস্থ্যের গুণমানের অভাব। যদিও কিছু ভালো প্রতিষ্ঠান আছে।

● স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রবণতা।

● অপ্রতুল বিচার ব্যবস্থা ও দুর্বল প্রশাসন। যার সরাসরি প্রভাব পড়ে অর্থনীতিতে। এত মিষ্টি জল থাকার পরেও আমরা মাছচাষে ব্যর্থ এবং অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা আমাদের মাছ খাইয়ে যাচ্ছে মুরগির মাংসের তিনগুণ দামে।

● রাজধানী দিল্লির রাজনীতি, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থায় বাঙ্গালির অভাব। কারণ গত ৪৩ বছরে কেন্দ্র বিরোধী রাজনীতি ও UPSC ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় গত কয়েক দশক এই রাজ্যের ছাত্রদের ধারাবাহিক অকৃতকার্য হওয়া এর অন্যতম কারণ।

সুযোগসুবিধা ঃ (১) আধুনিক পরিকাঠামোতে দেশের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। এই ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ প্রয়োজন তা রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান তো করবেই, উপরন্তু ইস্পাত, সিমেন্ট, পরিবহণ ক্ষেত্রেও প্রচুর লগ্নি আনবে।

(২) উচ্চমানের প্রযুক্তি তথা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিকস। বায়োটেক ও ফার্মাতে বিনিযোগ বাড়ানো সম্ভব হবে যা বাঙ্গালির শিক্ষা ও চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় এবং আগামীদিনে বাজারে যার চাহিদা আছে। সারা পৃথিবীতে বহু বাঙ্গালি এইসব ক্ষেত্রে ভালো জায়গায় আছে। তাঁদের ফিরিয়ে আনতে হবে।

(৩) কল্যাণী, ব্যারাকপুর, খড়্গপুর, বালুরঘাট কিংবা জলপাইগুড়ির মতো শহরে সিঙ্গাপুর, সাংহাই কিংবা কোটার মতো আন্তর্জাতিক বা জাতীয় মানের শিক্ষাকেন্দ্র বানানোর সবরকম উপাদান আছে। কোটার পুরো অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে কোচিং ব্যবসার ওপর। এই রাজ্যের অন্তত পাঁচটি শহরের কোটা হবার ক্ষমতা আছে।

(৪) ভেলোরের মতো চার-পাঁচটি স্বাস্থ্য হাব ও উপযুক্ত বায়োটেক হাব তৈরি করা যায় এই রাজ্যে। ভুটান, নেপাল, বিহার, বাংলাদেশের জন্য মেডিক্যাল পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে এই রাজ্য। আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় গ্রামবাঙ্গলার গরিবরা এলে সেখানে উচ্চমানের বেসরকারি স্বাস্থ্য বিনিয়োগ বহুগুণ বাড়বে। পাঁচটা ভেলোর বানানোর মতো মানব সম্পদ এই রাজ্যের আছে।

(৫) অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিগুলোকে বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে (JV বানিয়ে) ডিফেন্স হাব বানানোর সুবর্ণসুযোগ আছে মেক ইন ইন্ডিয়া পরিকল্পনায়। কাশীপুর, ইছাপুরের রাইফেল ফ্যাক্টরি যদি পাশ্চাত্য দেশের অর্ডন্যান্স কোম্পানিগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে রপ্তানিমূলক ব্যবসা শুরু করে, তবে বহু অনুসারী MSME তৈরির সুযোগ আসবে।

(৬) এখুনি পুরনো কৃষি বিপণন আইন ত্যাগ করে চুক্তি চাষ শুরু করা এবং হিমঘরে দেশি-বিদেশি ছুঁতমার্গ ছেড়ে বিনিয়োগের বন্যা আনা। এতে কৃষিজীবীদের আয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য ডেয়ারি ও চর্মজাত শিল্পে বিশ্বের বাজার ধরা শুধু সময়ের অপেক্ষায়।

(৭) বিনোদন শিল্পকে চেন্নাই, হায়দরাবাদের মতো সাজাতে হবে। 'আমাজন অভিযানের' মতো বহুভাষিক ছবি বানানো যেতে পারে কলকাতায়। ঘনাদা, টেনিদা, নন্টে ফন্টে, বাটুল ইত্যাদি বিভিন্ন পুরনো সাহিত্য/গল্পকে বহুভাষায় অনুবাদ করে বিশ্বের বহু কোটি টাকার মাল্টিমিডিয়া বাজারে প্রবেশ করা সম্ভব বাঙ্গালি যুবকদের।

(৮) হস্তশিল্পে এই রাজ্য পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পারে। দরকার শুধু সঠিক প্রযুক্তি, অর্থ ও বিপণনের সাহায্য।

(৯) আইনের প্রয়োগ করে এবং প্রশাসনকে ব্যবহার করে মৎস্যচাষকে মাফিয়াদের হাত থেকে বের করে আনতে হবে। তেলুগু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারেরা চাকরি ছেড়ে মাছ চাষ করে সেই মাছ আমাদের খাইয়ে চলেছে। কারণ আমাদের রাজ্যে সরকার সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ।

(১০) মহাকাশ ক্ষেত্রে গবেষণা ও উৎপাদনের সঠিক জায়গা পশ্চিমবঙ্গ। বহু বাঙ্গালি ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানী দেশে ফিরতে চায়। আইআইটি খড়্গপুরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেসরকারি বিনিয়োগের অনেক সুযোগ আছে। কলাইকুণ্ডার কাছে এই ধরনের শিল্পের কথা ভাবা যেতে পারে।

হুমকি ঃ

● ব্যবসা চুক্তিভঙ্গ রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। Enforcement of Contract নিশ্চিত করতে হবে।

● সক্রিয় রাজনীতি করা মানুষের সংখ্যা এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি। মানুষের রাজনৈতিক নেতার ওপর নির্ভরতা এবং নেতাদের কর্মীর ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে। এটা একটা অত্যন্ত অসুস্থ সংস্কৃতি।

● রাজ্যের মানুষের গড় বয়স বাড়ছে। কারণ মেধা পাচারের ফলে দক্ষ কর্মীরা চলে যাচ্ছে। যারা যাচ্ছে না, তাদের জন্য সঠিক কর্মসংস্থান নেই। বহু পরিবার অভিভাবক মারা গেল বাবার পেনশনের ওপর বেঁচে থাকে। একটা বড়ো আর্থিক সংস্কার না এলে বিশ্বের অন্যতম জনবহুল এই ভূখণ্ডে সামাজিক অস্থিরতা আরও বাড়বে এবং পরিস্থিতি একসময় হাতের বাইরে চলে যাবে। তখন কোনো টোটকাই কাজ করবে না।

তাহলে কীভাবে এগোতে হবে আগামীদিনে? উপরের আলোচনা থেকে আগামী পাঁচ বছরের কর্তব্যের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা যাক।

(১) **সংস্কার :** সময় নষ্ট না করে বিভিন্ন আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইন সংস্কার প্রয়োজন। যার মধ্যে জমি অধিগ্রহণ, বিদ্যুৎনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আয়কর ও পাসপোর্ট দপ্তরের মতো প্রশাসনিক সংস্কার, আধুনিক কৃষি আইন, বিভিন্ন দপ্তরের পুনর্গঠন, স্বচ্ছ জমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

(২) পরিকাঠানো : প্রথমেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রয়োজন গভীর সমুদ্র বন্দর। সঙ্গে সড়ক, ফ্রেট করিডোর, শিল্প করিডোর, বিমানবন্দর, জলপথ, কোল্ড স্টোরেজ, দ্রুত ইন্টারনেট পরিকাঠামো, শক্তিশালী ফিনান্সিয়াল হাব।

(৩) কিছু বড়ো শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র। সঙ্গে মেডিক্যাল হাব।

(৪) কিছু স্বাধীন (কলকাতার ওপর নির্ভরশীল নয়) বিমানবন্দর কেন্দ্রিক আর্থিক জোন বানাতে হবে যা কিছু ব্যতিক্রমী পণ্য বা পরিষেবা প্রদান করবে। যেমন কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি- শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ-বালুরঘাট, মালদা-বহরমপুর, মোড়গ্রাম-পানাগড়- আরামবাগ-ঘাটাল-হলদিয়া, রঘুনাথপুর-আসানসোল-অণ্ডাল-পানাগড়-বর্ধমান, রঘুনাথপুর-বাঁকুড়া-খড়্গপুর-হলদিয়া, শান্তিপুর- কল্যাণী-ডানকুনি-হলদিয়া ইত্যাদি।

আশির দশকেও ভারতবাসী ভারতের ব্যাপারে নেতিবাচক ছিল। মাত্র তেরো বছরে (১৯৯১-২০০৪) আমাদের দেশ আমূল পালটেছে। তবে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত মূলত। কয়েকদিন আগে বিশ্ববিখ্যাত আর্থিক সংস্থা মরগ্যান অ্যান্ড স্টানলি বলেছে, মাত্র ২০১৩ থেকে ২০২৩ ভারতের আরও বড়ো রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু এবারও উত্তর ও পূর্ব ভারতের ভাগে ডিভিডেন্ড অনেকটাই কম। বাধা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু সঠিক পদক্ষেপ মাত্র চার-পাঁচ বছরে এনে দিতে পারে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব। কলকাতার পুনরুজ্জীবন গঙ্গা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্রের দুইধারে কয়েকশো শিল্পনগরী এবং নদীবন্দর তৈরি করতে পারে। শিল্প আনবে বাণিজ্য এবং বাড়বে জীবিকার সুযোগ। বাড়বে জীবনের মান। দরকার শুধু রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আত্মবিশ্বাসের। □

*With Best Compliments from -*

**A**

**Well Wisher**

# জাদুঘরে মজে আছে দূরদূরান্তের বাচ্চারা

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** পার্কস্ট্রিটের কাছে ন্যাশনাল মিউজিয়ামে আমরা প্রায় সকলেই গেছি। এবং কিছুক্ষণ ইতিহাসের রোমাঞ্চ অনুভব করেছি। কিন্তু এভাবে কি কোনাদিন ভাবতে পেরেছি যে একদিন এমন আসবে যেদিন জাদুঘর দেখার জন্য আর আমাদের জাদুঘরে যেতে হবে না, জাদুঘর নিজেই চলে আসবে আমাদের দরজার ঠিক সামনে। আমরা ভাবতে না পারলেও কৃতিকা মাত্রে ভেবেছেন। তাঁর ভাবনার সূত্র ধরেই মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ বাস্তু সংগ্রহালয়ের উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে

'মিউজিয়াম অন হুইলস' প্রকল্প। এই প্রকল্পে দুটি বাস বৈভবশালী ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের নানান স্মারকে সজ্জিত হয়ে পৌঁছে যায় দূরদূরান্তে। এখনও পর্যন্ত এই ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর ভারতের ৭০০টি গ্রাম ও শহরে গেছে।

কৃতিকা বলেন, 'আমাদের দেশে জাদুঘর অন্যান্য পাবলিক প্লেসের মতো জনপ্রিয় নয়। সাধারণ মানুষ জাদুঘরের যে আইডিয়া তার সঙ্গে পরিচিতও নয়। ওরা জাদুঘরকে সেইরকম একটা জায়গা ভাবতে পারে না যেখানে ওরা আসতে পারে, সময় কাটাতে পারে এবং উপভোগ করতে পারে। এতদিন জাদুঘর বলতে আমরা বুঝতাম একটা বিশাল বাড়ি যার ভেতরে গ্যালারিতে সাজান রয়েছে নানান প্রাচীন জিনিসপত্র। এখন এই ধারণাটা বদলে গেছে। জাদুঘরে রাখা প্রতিটি জিনিস থেকে অনেককিছু শেখা যায়। এই ব্যাপারটা অনেকেই জানেন না।' কৃতিকা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, ' পৃথিবীর সব গ্রাম ও শহরে জাদুঘর নেই। বিশেষ করে যারা টায়ার-১ ও টায়ার-২ মানের শহরে থাকেন না তাদের পক্ষে তো জানা সম্ভবই নয় জাদুঘর জিনিসটা আসলে কী?'

২০১৫ সালে একটা বাস দিয়ে 'মিউজিয়াম অন হুইলস'-এর জয়যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের বিপুল উৎসাহ আর সমর্থন দেখে ২০১৯ সালে দ্বিতীয় বাসটি কেনা হয়। এব্যাপারে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক। মিউজিয়াম অন হুইলসের প্রথম দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কৃতিকা বলেন, 'প্রথম দিনের প্রদর্শনী হয়েছিল মুম্বাইতে। আমরা এমন একটা থিম বেছে নিতে চেয়েছিলাম যার কথা মোটামুটি সবাই জানে। তাই সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতাকে থিম হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। সাধারণ মানুষ সাদরে গ্রাহণ করেছে এই থিম। কিন্তু একই থিমে বারাবার সাফল্য আসবে না।। তাই আমরা ঠিক করি প্রত্যেক ছ'মাস অন্তর থিম পালটাব।'

কিন্তু থিম পালটানোরও একটা পদ্ধতি আছে। মিউজিয়াম অন হুইলসের থিম পালটানোর আগে কৃতিকারা কথা বলেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে। এর উদ্দেশ্য হলো কী ধরনের বিষয়বস্তু নির্বাচন করলে তা বাচ্চাদের কাছে আকর্ষণীয় হবে। বিশেষ করে বাচ্চারা স্কুলে যা পড়ছে সেখান থেকে যদি বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয় তাহলে সেটা ওদের কাছে শুধু যে আকর্ষণীয় হবে তাই নয়, পড়াশোনাতেও সাহায্য করবে। এখন পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রা, ভারতের পারম্পরিক খেলা, ইতিহাসের উৎস, ভারতে পাওয়া ফসিল ইত্যাদি নিয়ে অনেক প্রদর্শনী হয়েছে। বাচ্চারা এসব বিষয়ে খুবই উৎসাহ দেখিয়েছে।

গত সাত বছরে মিউজিয়াম অন হুইলস ১৪ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছেছে। কর্ণাটক, গোয়া, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও দিল্লি অঞ্চলে প্রায় ৮৫,৩৫৯ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে। সরাসরি পৌঁছে গেছে স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এমন একটি উদ্যোগ শুধু যে সময়োপযোগী তাই নয়, শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে মাইলফলকের মতো। বাচ্চারা বইয়ে যা পড়ছে তা যদি চোখের সামনে দেখতে পায় তার থেকে ভালো আর কী হতে পারে। বস্তুত শিক্ষার এমনতরো প্রাণপ্রতিষ্ঠা আর কোনোভাবেই সম্ভব নয়। □

# চড়ুই ও হাতি

তমাল গাছটা ছিল সেই মস্ত বনের মধ্যে। এক চড়ুই আর চড়ুইনি ওই গাছে বাসা বাঁধল। চড়ুইনি যথাসময়ে কয়েকটা ডিম পাড়ল। মনের আনন্দেই তাদের দিন কাটছিল। ঠিক

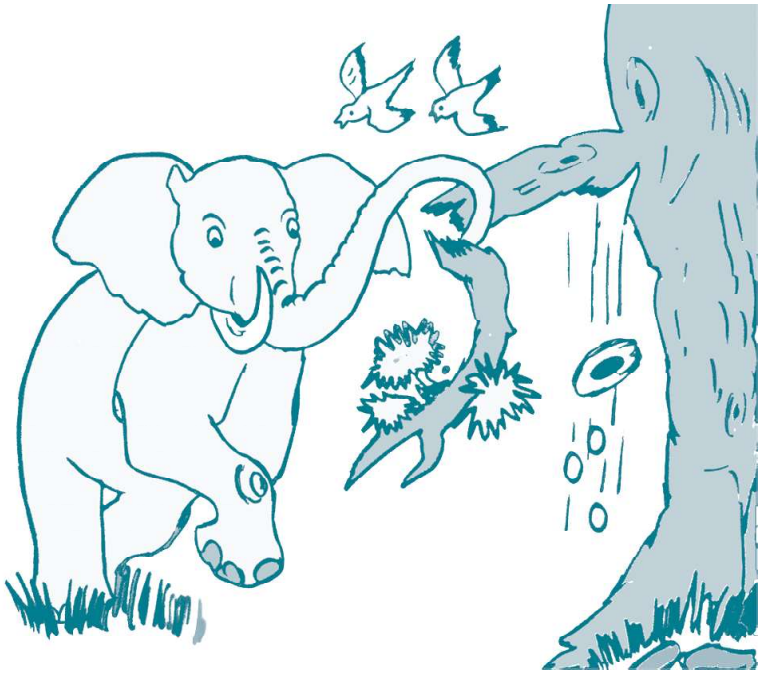

এমন সময় ঘটল এক বিপর্যয়।

গরমে অস্থির হয়ে এক দামাল হাতি সারা বন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। গাছপালা ভেঙে সবকিছু তছনছ করে ফেলছে। এক সময় এসে পড়ল ওই তমাল গাছের কাছে। শুঁড় দিয়ে টেনে হিঁচড়ে গাছটা একেবারে ভেঙে ফেলল। চড়ুইয়ের বাসা গেল ভেঙে। বাসা ও ডিমগুলোর একেবারে দফারফা। ভাগ্য ভালো ছিল, চড়ুইদম্পতি কোনোরকমে যে যাত্রায় বেঁচে গেল।

এতো বড়ো একটা ক্ষতি হলো সে দিকে হাতিটির কোনো হুঁশ নেই। সে ওভাবেই সবকিছু ভাঙতে ভাঙতে চলে গেল। এদিকে চড়ুইবউ ডিমের শোকে ডুকরে ডুকরে কেঁদে চলেছে। সে কান্না আর কিছুতেই থামে না। চড়ুইবউয়ের কান্নার কারণ জানতে ছুটে এল প্রতিবেশী কাঠঠোকরা। সবকিছু শুনে সেও হা-হুতাশ করে বলল – শান্ত হও ভাই। কেঁদে আর কী হবে। হাজার কাঁদলেও তুমি তোমার হারানো নিধি ফিরে পাবে না। চড়ুইগিন্নি কাঠঠোকরার কথায় একটু শান্ত হয়ে বলল, হাতিটা এমন করে আমার কোলের বাচ্চাদের শেষ করে গেল। আমি শোক ভুলতে পারছি না। তুমি যদি সত্যিই আমাদের বন্ধু হও, তাহলে বজ্জাত হাতিটাকে মারার একটা উপায় করো। তাহলে আমার দুঃখ ঘুচবে।

কাঠঠোকরা বলল— দেখো ভাই, বিপদের দিনে যে পাশে এসে দাঁড়ায় সেই প্রকৃত বন্ধু। তুমি দুঃখ করো না। ওই পাজি নচ্ছার হাতিটাকে কীভাবে জব্দ করতে হয় তা আমার জানা আছে। আমরা বরং আমার মাছিবন্ধু বীণারবাবের কাছে যাই। তোমার বিপদের কথা শুনে সে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে। কাঠঠোকরা আর চড়ুইবউ মাছিবন্ধুর কাছে এল

মাছি সব শুনে বলল, এর উপায় বলে দিতে পারে আমার বন্ধু মেঘনাদ। আমার ব্যাং বন্ধু। চলো আমরা তার বাসায় যাই। তিনজনে এল ব্যাঙের কাছে। সব শোনার পর মেঘনাদ চিন্তা করল খাকিক্ষণ। তারপর বলল, হাতিটা মোটেই ভালো কাজ করেনি। তার শাস্তি পাওয়া উচিত। আমরা সবাই মিলে এগিয়ে এলে হাতিটাকে জব্দ করতে কিছু কষ্ট হবে না। আমি যা বলছি, সবাই মন দিয়ে শোনো।

প্রথম কাজ হলো মাছি, তোমার। হাতিটা যখন বিশ্রাম নেবে তখন তুমি তার কানের কাছে গিয়ে ভনভন করে গান শোনাবে। দেখবে, হাতি আরামে চোখ বন্ধ করে ফেলবে।

এবার দ্বিতীয় কাজ। কাঠঠোকরা তার লম্বা ছুঁচালো ঠোঁট দিয়ে হাতির দুই চোখে ঠুকরে দেবে। যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে তেষ্টায় জলাশয়ের দিকে ছুটবে। আমি আমার দলবল নিয়ে কাছেই এক গর্তে মধ্যে বসে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাক তুলব। হাতি ভাবতের এটাই জলাশয়। সে ছুটে আসবে আর হুড়মুড় করে গর্তে পড়ে যাবে। মারাও যেতে পারে। মনে রেখো, সবার সাহায্য ছাড়া একাজ সম্ভব নয়। তার জন্য সকলকে একজোট হতে হবে।

পরদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল কাজ। দুপুরবেলা হাতি গাছতলায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় মাছি ভনভন করে উড়ে এল কোথা থেকে। হাতির কানের চারপাশ ঘুরে ঘুরে গান শোনাতে লাগল। আঃ, কী সুরেলা মিষ্টি গান! হাতি আবেশে চোখ বুজল। এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল কাঠঠোকরা। সে উড়ে এসে জোর ঠোক্করে হাতির দুই চোখ রক্তাক্ত করে দিল।

যন্ত্রণায় হাতি ছটফট করতে লাগল। ঘন ঘন গর্জন তুলল। বন কেঁপে উঠল। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে– একটু জল— একটু জল চাই। ঠিক এই সময় ব্যাঙের দল ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর রবে ডেকে উঠল। হাতি ছুটল সেই ডাক লক্ষ্য করে। আর যা হবার তাই হলো। পা মুচড়ে দুমড়ে ভেঙে গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। ছটফট করতে করতে কিছুক্ষণ পর মারা গেল।

চড়ুইগিন্নি বলল, যাক, বনের আপদ দূর হলো।

**সংগৃহীত**

## বীর বনবাসী

# ফুলো মুর্মু ও ঝানো মুর্মু

এই দুই বোন সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধো-কানুর বোন ছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাদাদের শুরু করা লড়াইয়ে এই বোনও পুরুষদের কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে শামিল হন। সাঁওতাল মহিলাদের গেরিলাযুদ্ধে নিপুণ করেন এই দুই বোন। একবার ইংরেজ ছাউনি আক্রমণ করে এই দুই বোন বহু গোরা সৈন্যকে হতাহত করার পর বীরগতি লাভ করেন। ঝাড়খণ্ড সরকার এই দুই বোনের স্মৃতিতে হঁসডিহায় ফুলো-ঝানো ডেয়ারি টেকনোলজিক্যাল কলেজ স্থাপন করেছে। এই দুই বোনের স্মৃতিতে দুমকা মেডিক্যাল কলেজের নাম ' ফুলো-ঝানো মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল' করা হয়েছে।

## জানো কি?

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'কবিগুরু' উপাধি দেন ক্ষিতিমোহন সেন।
- সুভাষচন্দ্রকে 'দেশনায়ক' আখ্যা দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে শিক্ষক দিবস পালিত হয়।
- ইন্ডিয়ান লিজিয়নের ভারতীয় সৈন্যরা সুভাষচন্দ্র বসুকে 'নেতাজী' সম্বোধন করে।
- মহাজতি সদন সুভাচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠা করেন।

## ভালো কথা

# কুকুরের ছাগলছানা

পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ব্লকের দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দাস্তিপাড়া গ্রাম। এই গ্রামের তন্ময় দাসের বাড়িতে এলে দেখা যাবে একটি মা কুকুর পরম যত্নে দুটি ছাগলছানাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। আসলে বেশ কয়েকদিন আগে ছাগলছানা দুটির মা মারা গেছে। ছানাদুটি খিদের জ্বালায় ম্যা ম্যা করে চিৎকার করছিল। সেই সময় মা কুকুরটি নিজের ছানাগুলির কাছ থেকে উঠে এসে ছাগলের ছানাদুটিকে দুধ খাওয়াতে শুরু করে। ছানাদুটিও আনন্দে দুধ খেতে থাকে। এর পর থেকে মা কুকুরটিকে দেখলেই ছানাদুটি ছুটে এসে দুধ খেতে শুরু করে। এই খবর জানাজানি হতেই বহু লোক দেখতে আসতে থাকে। কেউ কেউ মোবাইল ফোনে ছবি তুলে রাখছে। সবাই বলছে কুকুরের ছাগলছানা।

**সুদর্শন দেব,** নবম শ্রেণী, পূর্বস্থলী,বর্ধমান।

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## কবিতা

# হ্যাঁচ্ছো

**কণিকা মহান্তি,** ষষ্ঠ শ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

বৃষ্টির দেখা নাই রে নাই
একটু শীতল কোথাই পাই,
মন করে যে কোথাও যাই
একটু আরাম কোথায় পাই।

এসি ঘরে ঢুকতে মানা
আইসক্রিমও খেতে মানা,
মা বলে তোর সর্দি কাশি
একটু পরে হ্যাঁচ্ছো করবি।

**লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
*ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।*
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

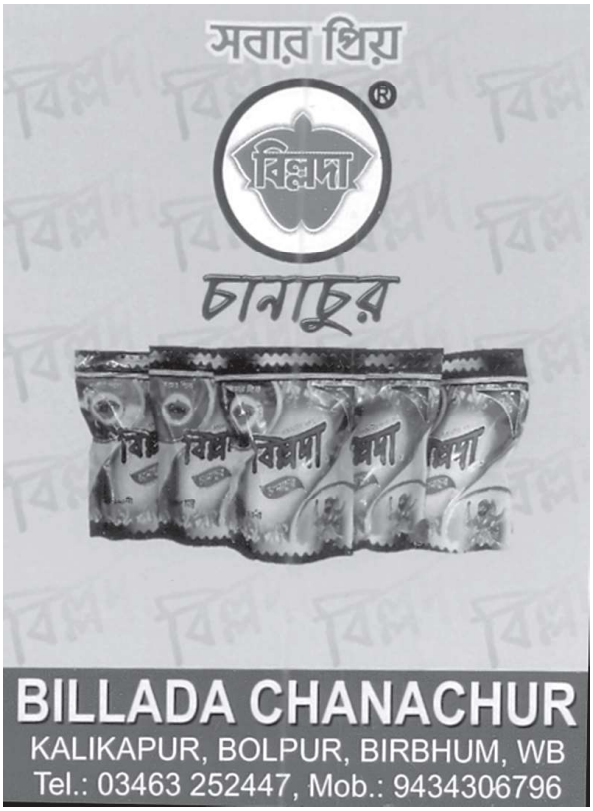


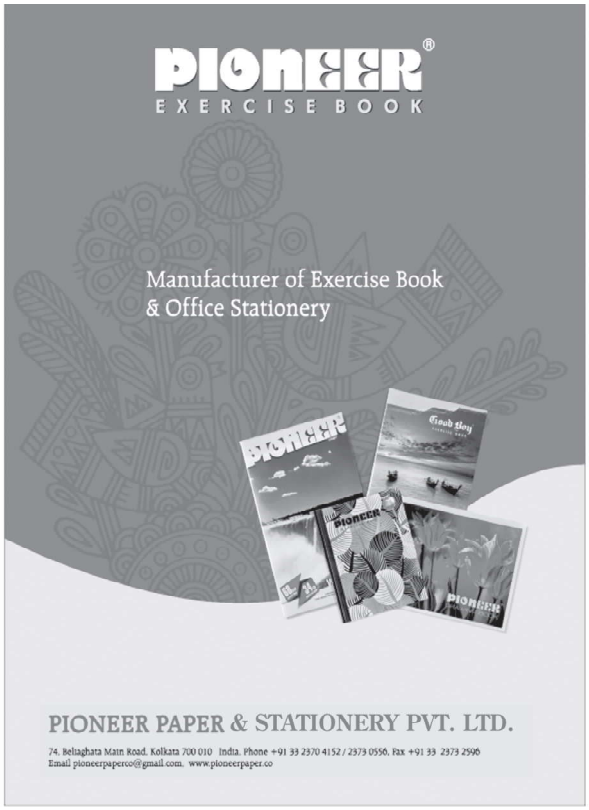


## যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

## বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের*
*ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।*
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

# বামপন্থীরা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে

সত্যভক্ত

**পল্লব মণ্ডল**

বামপন্থীরা পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা প্রচার এবং ইতিহাসকে বিকৃতীকরণের মাধ্যমে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। এই ধরনের মিথ্যা, পরিকল্পিত, ইচ্ছাকৃত অনুশীলনগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রজন্মের উপর একটি নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করেছে। ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের জন্য অবিলম্বে এটি সংশোধন করা প্রয়োজন।

বামপন্থীরা সবচেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িকতার দায়ে দুষ্ট। ১৯২০ সালে মস্কোতে কমিউনিস্ট পার্টির যে অধিবেশন হয়েছিল তাতে ও পরে ষষ্ঠ অধিবেশনে গান্ধীজীর জাতীয় আন্দোলন এবং স্বরাজের বিরোধিতা করা হয়েছিল। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত তারাই ব্রিটিশ এবং মুসলিম লিগের চোখের মণি ছিল। তাই ডাইরেক্ট অ্যাকশন থেকে শুরু করে দেশভাগ সর্বত্রই তারা ব্রিটিশ ও লিগের সম্পূর্ণ সমর্থক ছিল। ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের সময় কমিউনিস্টরা ইসলামিক শক্তির সঙ্গে একজোট হয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন করেছিল। কমিউনিস্টরা কি অস্বীকার করতে পারবে, তারা সংখ্যায় যথেষ্ট ছিল না সোভিয়েত ইউনিয়ন জয়ের পক্ষে?

তাই লেনিন সেদিন ঘোষণা করেছিলেন, 'To all toiling Moslems of Russia and East, whose mosques and prayer houses have been destroyed, whose beliefs have been trampled on by the Czars and th eppressors of Rus-Asia. You beliefs and customs, your national and cultural institutions are declared henceforth free and inviolable... ওই রাশিয়ার কৃষক শ্রেণীর বড়ো অংশ ইসলাম হওয়ায় লেনিনকে বিশেষ অনুরোধে ধর্মের নামে বিপ্লব সংগঠন করতে হয়েছিল। যে সমাজ চার্চ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তারা যদি সেই মাটিকে দার-উল-হারব (যেখানে ইসলাম চর্চা বন্ধ দ্বারেই করা যায়) থেকে দার-উল-ইসলামে (যেখানে অবারিত ইসলামিক চর্চার অনুমতি) রূপান্তরিত করে তা আসলে অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞাপনের কভার স্টোরিতে ধর্ম উৎসাহের রোমান্টিসিজম। যে রোমান্টিক হাওয়া লেনিন দেখালেন তার গতিরূপ বদলে দিলেন স্তালিন। স্তালিন যখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের মিত্র হলো, তখন কেমন করে এদেশের কমিউনিস্টরা দেশ স্বাধীন হোক চাইবে? স্তালিন চাইতেন ভারত ভূখণ্ড ১৬টি আলাদা রিজিয়নে ভাগ হোক। আর তিনিই বলেছিলেন ইসলামের জন্য, autonomous state চাই— The right to form autonomous states and even to separate if they so wished... নিদান ছিল ভারতের জন্য। ভারত ভাগের জন্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৪-এর টগবগে কমিউনিস্ট নেতা সাজ্জাদ জাহির, যিনি দেশ ভাগের পর পাকিস্তানি কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন তিনি ভারতের প্রত্যেক প্রান্তে ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের পৃথক ভূখণ্ডের দাবিকে প্রখর করেন এবং জিন্নাকে তাদের সর্বোচ্চ নেতা স্বীকার করেন। বামপন্থী কমিউনিস্টদের দেশকে বিখণ্ডিকরণের ধারাবাহিক কুৎসিত প্রয়াস অবশেষে বল পায়। যখন ইন্দিরা গান্ধীর দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন চেয়ে বসে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তাদের স্বার্থ চরিতার্থের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস-I-কে সমর্থন করে, তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল শিক্ষা দপ্তর হস্তগত করা। বামপন্থী 'ইতিহাসবিদ' সাইয়িদ নুরুল হাসান ১৯৭১ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হন। ফলস্বরূপ, ভারতীয় ঐতিহাসিক একাডেমিয়া এবং গবেষণায় নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। শিক্ষায় রাজনীতিকরণ, সব কমিটিতে রাজনীতির লোকেদের প্রাধান্য শুরু হয়। এরপর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিকাল রিসার্চ পুরোপুরি বামপন্থী ঐতিহাসিকরা দখল করে নেয়।

ইতিহাসের মুখবন্ধ করা হয়েছে তার গলা কেটে। সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে সমগ্র জাতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হয়েছে। সংবিধানের 'preamble' যাকে সংবিধানের আত্মা বলা হয় সেখানে এমারজেন্সির সুযোগ নিয়ে সেকুলারিজম ও সোশ্যালিজম ঢুকিয়ে সমগ্র জাতিকে প্রতিবন্ধীতে পরিণত করা হয়েছে ঘৃণিত রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য। মিথ্যাচার ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে আর্টিকেল ৩০-এ, ৩৫-এ-র মধ্যমে সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজকে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই দেশের মুসলিম লিগের সদস্যরা দেশ ভাগের পরে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে এরাই রাতারাতি বামপন্থীদলে আশ্রয় নেয়, বৃহত্তর ইসলাম সমাজকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হয় কমিউনিস্ট শক্তি। আজও জামিয়া মিলিয়া,

জেএনইউ-এর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মুসলিম লিগধর্মী বামপন্থীদের আধিক্য।

এই মুসলিম লিগধর্মী বামপন্থী নেত্রী অরুন্ধতির গলায় একাধিকবার স্লোগান উঠেছে কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ নয়। সরকার যারই হোক না কেন সিস্টেম তাদের। যার ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শেষ হয়ে যাচ্ছে। বামপন্থী মতাদর্শ আমাদের ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশেই দায়ী। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ভারত দিনের পর দিন মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং অনাবশ্যক মুসলমান তোষণকারী দেশে পরিণত হয়েছে। কমিউনিস্ট নীতির ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বামপন্থী মতাদর্শের প্রচার তরুণদের মধ্যে একটি বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে পরিচালিত করেছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ, পক্ষপাতদুষ্ট এবং এটি বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনার উপর মুখস্থবিদ্যাকে উৎসাহিত করে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে শিশুদের প্রতিভা একটি ইচ্ছাকৃত নকশা দ্বারা দমন করা হয়েছে। এইভাবে, তারা একাডেমিয়ায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব পোষণ করে। সুশীল সমাজের গভীর পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনের ফলে বামপন্থী লবি অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। মূল সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক 'সঞ্জীব সান্যাল' বলেছেন—

'The Left dominane over the intellectual establishment has its roots in the systematic 'ethnic cleansing' of all non-Left thinkers since the 1950s...the result of the systematic cleansing was that there were no non-Left academics remaining in the social sciences field in India by the early 1990s.'

ভারত জুড়ে বামপন্থীরা প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাধান্য বিস্তার করে তাদের মুষ্টিগত করেছে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো জেএনইউ, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি এবং এএমইউ। বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীকে পদ্ধতিগত ভাবে মুছে ফেলা বাম-আধিপত্যবাদীদের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে এবং তাদের দ্বারা প্রচারিত উদারনৈতিক ধারণাটি একটি প্রতারণা, কারণ বামপন্থীরা কোনো ভিন্নমত সহ্য করবে না। পুরানো হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মুছে ফেলা এবং ইসলামিক ও খ্রিস্টান বর্বরতার মহিমান্বিতকরণ একই ঘটনার উদাহরণ। এটা সত্যিই হতাশাজনক যে এই স্ব-ঘোষিত বুদ্ধিজীবীরা আমাদের ঐতিহ্যগত ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চর্চাকে পদদলিত করেছে। বর্তমান প্রজন্ম মহাভারত, তিরুবাল্লুবর কুরাল বা শান্তিপর্বের কথা শোনেনি? দুঃখজনক সত্য হলো যে মুষ্টিমেয় লোকই আছেন যারা উপলব্ধি করে যে এই ধরনের অমূল্য প্রাচীন গ্রন্থের অস্তিত্ব রয়েছে।

ড. অভয় ফিরোদিয়ার মতে, 'আমরা বামপন্থীদের প্রতি চরমভাবে ঝুঁকেছি এবং আমাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ণ করেছি। যে ইতিহাস শেখানো হয়েছে তা বিদ্বেষপূর্ণ, কৃত্রিম ও মিথ্যাচার, যা আমাদের ভূমির প্রতি আমাদের আবেগকে ভেঙে দিতে, আমাদের আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করতে এবং আমাদের নিজেদের আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা, রুচিশীলতার উপর ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। যার জলজ্যান্ত উদাহরণ হলো, বামপন্থী চিন্তাবিদ চকন লালের সঙ্গে হওয়া অপমানজনক ব্যবহার, তিনি ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট কনফারেন্সের (১৯২৫ ডিসেম্বর, কানপুর) মুখ্য উদ্যোক্তা যিনি সত্যভক্ত নামে পরিচিত। তিনি বলেছিলেন কমিউনিজম ও হিন্দুত্বের যোগ ঘটলেই ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যখন তিনি কানপুর থেকে সত্যযুগ ও ভারত প্রকাশ করলেন, তখন ওইটিই ছিল তাঁর বার্তা। তিনিই কৃষ্ণ ও রাম অবতারের তুলনা আনলেন কমিউনিস্ট পরিসরে। যারা প্রকৃত সাম্যবাদের প্রতীক। যারা নিপীড়িত মানুষের ত্রাতা। কেবল লেনিল-মার্কস কেন? ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে তিনি ভারতীয় করতে চেয়েছিলেন। এই ছিল তাঁর দোষ।

কেউ সমর্থক করেনি তাঁকে। কানপুর সমাবেশে উপস্থিত তাবড় সব কমিউনিস্ট নেতা হজরত মোহানি থেকে এসভি ঘাটে কিংবা মুজাফফর আহমেদ— সবাই রেগে বোম। সত্যভক্ত বলেছিলেন এই দলের নাম হোক ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি। যা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, গৌরবের কাহিনি, হিন্দুত্বের মহিমা এবং তার সঙ্গে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সাম্যবাদের প্রচার করবে। কিন্তু কমিউনিস্টরা যে আসলে অ-স্পিরিচুয়াল। তাই সত্যভক্ত হলেন কোণঠাসা। তাঁর প্রস্তাব উড়িয়ে দেওয়া হলো। ১৯২৭ সালে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয় সরকারি চর অপবাদে। হিন্দু লেফট-অভিধানেই নেই। হিন্দু-লেফট যেন oxymoron! এইটাই তো ভারতের কমিউনিস্টদের মজার খেলা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম, প্রধান এবং শেষ অন্যায় হিন্দুত্বকে দূরে ঠেলা। হিন্দুর ইতিহাস বর্ণনায় যথাসম্ভব দৈনতা এবং ভারতীয় দর্শনবোধ থেকে দূরত্ব স্থাপন। তাই এই সত্যটা উদ্‌ঘাটনের জন্য 'Conservative thought' এই বইটি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে পৌঁছানো উচিত, কারণ এটি একটি যুক্তিপূর্ণ এবং অহিংস পালটা পয়েন্ট উপস্থাপন করে।

এই বাম অনুপ্রাণিত ভারধারা ভবিষ্যতের অঙ্কুরিত সমাজ ব্যবস্থার উপর আদর্শগত ভাবে কঠোর ফলাফল দেয়। এটি অসম প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি একটি তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে পরিচালিত করে। ইসলাম, বাক্‌স্বাধীনতা বা বামপন্থী উগ্রবাদের নামে রাজনৈতিক সহিংসতার প্রকাশ্য আলিঙ্গনের কারণেই এই সামাজিক অবক্ষয়। ন্যাশনালিজম ও স্পিরিচুয়ালিটির মধ্যে যে গভীর সংযোগ রয়েছে তা জানতে পারেনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। বামপন্থীরা হিন্দু-হিন্দুত্ব বিরোধিতা প্রমোট করে। ওরা প্রকাশ্যে গোমাংস চেটেপুটে খায়, দেব-দেবী নিয়ে বিকৃত মিম করে। তা হয়ে যায় ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু একজন বামপন্থী মুসলমান ইয়াকুব কিংবা আফজল গুরু বা বুরহান ওয়ানিকে আদর্শ বলে মানে। ওদের সঙ্গে নাকি না-ইনসাফি হচ্ছে। প্রতিবাদে ভারত টুকরো করার স্লোগান। আবার ওই ওরাই ক্ষুদিরামকে সন্ত্রাসবাদী বলে। এখনও মানে, বলে কম। বামপন্থীরা মুসলমান আক্রান্ত হলেই প্রতিবাদে মুখর। কিন্তু লাভ

জিহাদে যখন শরীর ৩৫ টুকরো হয়ে যায় যখন চোখে ঠুলি, মুখে কুলুপ। তখন মিছিল বার করলে তা যে সম্প্রীতি বিনষ্ট করে। ওদের চোখে রামনবমী উগ্রবাদ, অস্ত্রের আস্ফালনে মহরমের মিছিল শান্তির বার্তা বহণকারী। আরবি সংস্কৃতির বোরখা হলো গণতন্ত্রের চিহ্ন।

যোগী আদিত্যনাথ ভীষণ উসকানিমূলক কথা বলেন কিন্তু আসাদউদ্দিন ওয়েসি কখনওই বিতর্কিত কথা বলেন না। বামপন্থীদের আরও এক বড়ো এজেন্ডা ইতিহাস বিকৃত করা। সত্যভক্ত সেই ইতিহাস উন্মোচন করে হিন্দুত্বের মর্যাদা চেয়েছিলেন। ইতিহাস একটা জাতির অনুসন্ধান এবং পর্যায়ক্রমিক বিবরণের দলিল। তাই এখানে যত বেশি বিকৃতি আমদানি করা যাবে তত বেশি পার্টির এজেন্ডা মজবুত হবে। সমাজের পট এবং সংস্কৃতির পরিবর্তন করা যাবে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য এক অতি সাধারণ বিষয়, তাই এই একটা পথ, যে ঐতিহাসিক যতবেশি পার্টির অনুগত হবে, যতবেশি পার্টি লাইনে ভারতীয় সত্য গৌরব মুছতে পারবে সে হবে তত দামি ঐতিহাসিক। ইতিহাস তো সরাসরি দেখা যায় না। ঐতিহাসিক পার্টির ইয়েস বস নিয়মে কালের পর কাল অর্ধসত্য বিকৃত এবং তুষ্টিকরণের ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারা হলো যারা তাদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা পূরণের জন্য সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা উসকে দেওয়ার জন্য জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অর্ধসত্য এবং বানোয়াট কথা ব্যবহার করে।

এনসিইআরটি-তে বামপন্থী মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের দ্বারা কি ইতিহাস পরিবেশিত হয়েছে তা সবাই জানে কীভাবে আমাদের স্কুলের পাঠ্যক্রম কতটা ভালোভাবে ডিজাইন করা হয়েছে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে। অত্যাচারী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক ও বর্বর মুঘলদের এক অন্যন্য উচ্চতা প্রদান করা হয়েছে। বামপন্থী ইতিহাসের কারণে এই লুণ্ঠনকারীদের তুলনায় সনাতন মূল্যবোধ, অনুশীলনগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল ও নিকৃষ্ট দেখানো হয়েছে। এনসিইআরটি-র ইতিহাসের বইগুলি তাদের ছলনার দ্বারা আমাদের গর্বিত ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক বৌদ্ধিক বিকাশ রুদ্ধ করার জন্য চতুরতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, হিন্দুদের একেরপর এক প্রজন্ম মগজ ধোলাই ও অপদস্থ হয়ে পড়েছে। বামপন্থী ইতিহাসবিদ যেমন রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিব, যোগেন্দ্র যাদব প্রমুখ এনসিইআরটি পাঠ্যক্রমে ডিজাইন করেছেন বিভ্রান্তিমূলক ইতিহাস। এই ঐতিহাসিকরা যতই গোলাপি ছবি আঁকার চেষ্টা করুক না কেন, সত্যকে ভুলে ভুলিয়ে দিতে পারেনি। কোনো না কোনো সময় কোনো না কোনো লেখকের কলমে স্বমহিমায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বাবর থেকে শুরু করে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল শাসকরা জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, হিন্দু নারীদের ধর্ষণ ও হত্যা করেছে, হিন্দু মন্দিরগুলো ধ্বংস করেছে এবং হিন্দু ধর্মকে নির্মূল করার চেষ্টা করেছে। এনসিআরটি পাঠ্যক্রমে মার্কসবাদী ও হিন্দুবিদ্বেষী কমিউনিস্ট জঠরে লালিত পালিত ঐতিহাসিকদের দ্বারা আমাদের শেখানো হয় যে ঔরঙ্গজেব ও শাহজাহানের মতো মুঘল শাসকরা যুদ্ধের সময় ভেঙে যাওয়া হিন্দু মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য অনুদান দিয়েছিলেন। অথচ সত্য হলো কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমান শাসকদের দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধে ৪০ হাজারেরও বেশি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, এই বিভ্রান্তিমূলক ইতিহাস চর্চার ফলে ছোটোদের মন ছোটোবেলা থেকেই বিষাক্ত হয়ে যায়। পরিবর্তে, তারা বামপন্থী মতাদর্শের প্রচারের অনুঘটক হয়ে উঠে। কমিউনিস্টদের দ্বারা রচিত পাঠ্যপুস্তকে তারা মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়ায়, তাদের দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। এই ধরনের বইগুলি অত্যাচারী ও বর্বর মুঘলদের সহনশীল ও বড়ো মনের শাসক হিসেবে চিত্রিত করে, তারা নাকি অত্যাচারী হিন্দু রাজাদের অত্যাচারী শাসন থেকে হিন্দুদের মুক্ত করেছিল।

পরিশেষে এটাই বলা যায়, আমাদের দেশ তিনবার আক্রান্ত, ইসলামিক শাসন, ইংরেজ আমল এবং তারপর ও এখন কমিউনিস্ট ইন্টেলেকচুয়াল শাসন। যারা ক্রমাগত ভারতীয় সংবিধানকে, বিচারব্যবস্থাকে নিজেদের পাপ লুকানোর জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যাচ্ছে। সত্যিই যদি সংবিধান দেখা হয়, আমাদের সংবিধান এতটা উদার নয় যেটা আমাদের 'বামপন্থী উদারপন্থী'দের দ্বারা মিথ্যাভাবে প্রচার করা হয়েছে। বাক্‌স্বাধীনতার উপর সম্ভাব্য বিধিনিষেধ রয়েছে। যদিও আমাদের প্রিয় ভারতীয় উদারপন্থীরা তাদের সুবিধামতো ক্রমাগত গর্জন করে এবং সাংবিধানিকভাবে দেশপ্রেমিক হওয়ার একটি মুখোশ উপস্থাপন করে।

মেকলের বিকৃত মতাদর্শ ও পক্ষপাত পদ্ধতিগতভাবে বাম- প্রভাবিত শিক্ষার মধ্যে গ্রথিত করা হয়েছে। অভিজাত শিক্ষার প্রসারের নামে মার্কসবাদীরা শিক্ষা ব্যবস্থায় আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে, কমিউনিজম আসলে যা প্রচার করে তারা তার সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এর মোকাবিলা করবে কে? আমাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সমালোচিত হচ্ছে। এটি পশ্চিমি দেশগুলিকেও প্রভাবিত করেছে। নেহরুভিয়ান- মার্কসবাদী ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পদ্ধতির কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তার ফলে ইতিমধ্যেই একটি প্রজন্ম অতি-সাম্প্রদায়িক ও তথাকথিত উদারপন্থীতে পরিণত হয়েছে। এটি কেবল আমাদের সনাতনী নীতি ও মূল্যবোধকে দুর্বল করেনি, বরং এটি হিন্দুদেরও রক্ষণাত্মক পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে সিলেবাস সংশোধন করতে হবে, যা দীর্ঘদিন ধরে থমকে আছে ৯ বছর সফলতাপূর্বক সরকার চালানোর পরও। যদি অবিলম্বে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে, এটা একদম ধ্রুব সত্য। বল্লভভাই প্যাটেল বলেছিলেন, 'আমি অনুভব করেছি আমাদের তথাকথিত ভারতের ইতিহাস রচনা ত্রুটিহীন নয় এবং সত্যের পথেও হাঁটেনি।' কমিউনিস্টরা যে ধরনের আচরণ এই দেশের সঙ্গে করেছে করে চলেছে তা মগজ অনুপ্রবেশের অধ্যায়। তা ভারত আত্মার সঙ্গে তঞ্চকতা। □

# পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র এখন উলঙ্গ

**সুবল সরদার**

মুঘল শাসক থেকে, ব্রিটিশরাজ থেকে আমরা স্বাধীন, গণতন্ত্রমুখী। ব্রিটিশ পিরিয়ডের অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা এখন স্বাধীন। আমরা কত বড়ো ব্রিটিশ বিরোধী তার প্রমাণ আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস থেকে জানা যায়। দেশপ্রেম সবুজে-লাল-গেরুয়ায় নানা রঙে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। কেউ দেশপ্রেমিক হয়েছেন, কেউ বিপ্লবী হয়েছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস ঘটনা আমাদের ব্রিটিশ বিরোধী করে তোলে। তাদের উপর রাগ, ক্রোধ সংঞ্চার করে। কিন্তু মুঘলদের শোষণ, অত্যাচার, ধর্মান্তরকরণ, মঠ, মন্দির, লুঠ, ধ্বংস, খুন, ধর্ষণ আমাদের মনে কেন রেখাপাত করে না? ব্রিটিশদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি শোষণ, অত্যাচারের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে আমরা প্রতিবাদ করি, আন্দোলন করি কিন্তু মুঘলদের ঘৃণ্য জিজিয়া কর, ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতিতে আমাদের মনে কেন রাগ, বিদ্বেষ সৃষ্টি করে না? কেন নীরব থাকি? কেন আপোশ করে চলি? ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হবে বলে?

ভাবুন, ভাবন, এখন থেকে ভাবা প্র্যাকটিস করুন। ব্রিটিশরা যদি শত্রু হয়, মুঘলরা কী করে মিত্র হয়? এসব ইতিহাসের খেলা, না ইতিহাসবিদদের জাদু বিদ্যা? মুঘলদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনি ভোলাতে শুধু ব্রিটিশদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনিতে ইতিহাসের পাতা ভরে উঠেছে। তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজ যেমন ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তেমন মুঘলদেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা মুঘলদের সেবা করে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। আকবরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন মান সিংহ যার বোন যোধাবাঈকে বিয়ে করেছিলেন বাদশা আকবর। প্রধান সেনাপতি পদটা তার কাছে উপহার পাওয়া বলা যায়। পলাশীর যুদ্ধের মতো তিনিও এক মীরজাফর। মীরজাফর একা শুধু বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। এমন গরল ইতিহাসকে আমরা অমৃত বলে পান করছি। হিন্দু নিধন করছে হিন্দু সেনাপতি! পৃথিবীতে এমন ষড়যন্ত্রের ইতিহাস আর কোথাও পাওয়া যায় না। গোলামি করতে করতে কখন আমরা দাসত্বের ইতিহাস আয়ত্ত করে ফেলেছি।

ব্রিটিশদের প্রধান গুপ্তচর সেনাপতি ছিলেন আমাদের প্রিয় এক নেতা। জনজাতিদের আরও দূরে সরাতে তাঁদের তিনি হরিজন বলে চিহ্নিত করলেন। আমরা পেলাম হরিজন থেকে মহাজন (জাতপাতের রাজনীতি যাকে বলে), ছোটো লোক থেকে বড়ো লোক, নেতা থেকে আমজনতা। এমন বিভাজনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশদের রথের চাকা মসৃণ ভাবে চলতে শুরু করে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলেই তাঁর আমরণ অনশন শুরু হয়। তখন কে রুখে ব্রিটিশদের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা? তাই ইতিহাসের হাতে ছেড়ে দিতে জনগণমনের ভাগ্যবিধাতাকে। অনেক রক্ত, দেশ ভাগের বিনিময়ে আমরা পেলাম সেই অনাস্বাদিত স্বাধীনতা। মধ্যরাতের সেই স্বপ্ন আমাদের কাছে এখন দুঃস্বপ্ন বলা যায়।

বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান বইতে আমাদের গণতন্ত্রের ঘড়ে এখন ব্যথা। সেটা প্রিয়েমবেল অব দ্যা কনস্টিটিউশন থেকে বোঝা যায়। আমাদের সংবিধান গণতান্ত্রিক আবার রিপাবলিক। গণতান্ত্রিক হলে গণতন্ত্রই শেষ কথা। তবুও সে রিপাবলিক! সংবিধান গণতান্ত্রিক আবার সমাজতান্ত্রিক। আমরা গণতান্ত্রিক জানি। আমরা সমাজতান্ত্রিক হলাম কবে থেকে! যদিও এখন দুটোর কোনোটাই নেই। আছে সুগার কোটিং পিলের মতো ধর্মনিরপেক্ষতা। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মসজিদের দেশের নাম ভারত, তবুও সে ধর্মনিরপেক্ষ। হাস্যকর বটে। ইংরেজরা যদি

এদেশে না আসত কী হতো? জিজিয়া কর দিয়ে কিংবা ধর্মান্তরিত হয়ে বাঁচতে হতো। এখন যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বেঁচে আছি। সংখ্যাগুরুকে (বৌদ্ধ, জৈন বাদ দিয়ে) সংখ্যালঘু বলে চেঁচিয়ে যাচ্ছি।

হিন্দু বিরোধী ইতিহাসের ধারা প্রতিরোধে করবে কে? বিদেশি আক্রমণকারীরা কখনো দেশপ্রেমিক হয়, যাদের রক্তে আছে নিষ্ঠুরতা, মরু উষ্ণতা? তাদের স্বাদেশিকতা ছিল কেবল গদি টিকিয়ে রাখা। তাই তাদের দেশেপ্রেমের প্রতিদান হলো দেশ ভাগ। সেই দৃশ্য সদ্য কর্ণাটকের বিধান সভার নির্বাচনে দেখা গেল। মুসলমানদের সাহায্যে নাকি সেখানে কংগ্রেস জয় লাভ করে, তাই তারা উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ দাবি করে বসে।

ঘোরালো, পেঁচালো শব্দ দিয়ে জনগণকে বোকা বানানোর সহজ উপায় হচ্ছে আমাদের এই সংবিধান যা ডুবন্ত টাইটানিক জাহাজের মতো। ওই জাহাজডুবির সময় একমাত্র ভিআইপি যাত্রীরা কেবল লাইফ বোট চড়তে পারবে। তাদের প্রাণ নাকি মূল্যবান আর বাকিদের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ সলিল সমাধি। এমন প্রাণ বাঁচিয়ে রেখে কী লাভ। নেতা আর জনতা মিলে আমাদের গণতন্ত্র। তাঁদের জন্যে দেশটা আর আমাদের জন্যে শুধু ছোবড়াটা! রাজতন্ত্রের উত্থান-পতন, সরকারের পতন-উত্থান যাই হোক, জনগণ যে তিমিরে ছিল আজও আছে।

আঞ্চলিক দল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি বলেই ফেললেন চাকরি চুরি গোরু পাচার, কয়লার চুরির মতো দুর্নীতির দায়ে যদি কখনো তাঁর জেল হয়, তিনি কয়েদ খানায় কতদিন থাকবেন? খুব বেশি হলে পনেরো দিন? এক মাস? বড়োজোর ছয়মাস? নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উলঙ্গ রাজার সেই ছেলেটার মতো তিনি বলেই ফেললেন গণতন্ত্র, তোমার পরনের কাপড় কই? দুর্নীতি কখনো দুর্নীতির ধার ধারে? পলেস্তারা খসে খসে গণতন্ত্রের কঙ্কালসার চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে। আমাদের গণতন্ত্র এখন সত্যিই উলঙ্গ। বিচার ব্যবস্থাও পারে না তাদের লাগাম ধরতে।

সামনে পঞ্চায়েত ভোট। হাতে সময় নেই। তড়িঘড়ি নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হয়েছে। মনে হয় জনগণ ভোট দানে বিরত থাকলে কিংবা সব ভোট শাসক শ্রেণীকে দিলে ভালো হয়। জনগণ বাদ দিয়ে যদি গণতন্ত্রের উদাহরণ দিতে সেটা হবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট একঝলকে দেখে নেওয়া যাক— 'পঞ্চায়েত ভোট-২০২৩'। রাজ্যে এক দফায় পঞ্চায়েত ভোট ৮ জুলাই। (দার্জিলিং, কালিম্পং ২ স্তর বাকি সব ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত)

৮ জুন থেকে জারি নির্বাচনী বিধি (মডেল কোড অব কনডাক্ট)। ৯ জুন থেকে মনোনয়ন জমা দিতে পারবে। ১৫ জুন পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে। নির্বাচনী প্রচার করা যাবে না রাত ১০টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত। পঞ্চায়েতের প্রচার করা যাবে ৬ জুলাই পর্যন্ত। নির্বাচন কমিশনারের হঠাৎ এমন ঘোষণা দেখে আমাদের মনে খটকা লাগে। মনে হয় গণতন্ত্রের উপর তাঁদের কোনো আস্থা নেই। আমাদের দেশ আছে, গণতন্ত্র নেই। নির্বাচন আছে, ভোট নেই। মধু কবির ভাষায় বলি, এ বঙ্গের নির্বাচনী' কুনাট্য নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়?' ক্ষমতার দাপাদাপি, দাদাগিরি, মস্তানি, যুদ্ধের হুংকার, গোলা-গুলি, পিস্তল, রক্ত, মানুষের লাশ এসব হচ্ছে নির্বাচনী প্রচারের অনুষঙ্গ। উন্নয়নের খতিয়ান বা ইস্তেহার কোথায়? নির্বাচন কমিশনার, শাসক, মহাশাসক, প্রশাসন এখন সবাই আমজনতার মতো নির্বাক দর্শক হয়ে থাকে। নির্বাচন বলে কথা! বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে এ কী নির্বাচনী মহিমা! অবশ্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সবসময় একটু এগিয়ে থাকে। এখানে নির্বাচন রক্তে ভাসা লাশের উপর দিয়ে হয়। তাই আসন্ন পঞ্চায়েত ভোট আমাদের মাথা যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে বইকী। আগেরবারের মতো এবারেও কি ভোট দিতে পারবো না?

# ঘুরে দাঁড়াতে চলেছে বিএসএনএল

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকেই বিএসএনএলের বা ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের গ্রাহক সংখ্যা কমতে থাকে। পেজার বা মোবাইল যুগ শুরু হবার পর থেকে বে-সরকারি মোবাইল পরিষেবার রমরমা কারবার শুরু হয়। দেশের সরকার নিয়ন্ত্রিত একমাত্র টেলি-যোগাযোগের সংস্থার অন্তর্জলিযাত্রার সেই শুরু। দেশের টেলি যোগাযোগের একচেটিয়া কারবারে ধস নামে। ২০০৮-০৯ সালে টুজি স্পেকট্রাম বিক্রি নিয়ে অনেক কেলেঙ্কারি সামনে এসেছে এবং মামলা শীর্ষ আদালত অবধি গড়ায় এবং এনিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় তৎকালীন ইউপিএ সরকারকে। জেলে যেতে হয় মন্ত্রী-আমলাদের। এরপর বেসরকারি হাতে চলে যায় একে একে 'থ্রি-জি', 'ফোর-জি' এবং আধুনিকতম 'ফাইভ-জি' পরিষেবা।

এবারে মোদী সরকারের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়াতে চলেছে সরকার নিয়ন্ত্রিত এই একচেটিয়া পরিষেবাটি বিএসএনএলের মাধ্যমে। এবার শুধু গ্রাহক হারানো নয়, সরাসরি গ্রাহক 'ঘর-ওয়াপসি' শুরু করবে এই সংস্থাটি। অক্টোবর-নভেম্বর থেকে শুরু হবে গ্রাহকদের ঘরে ফেরা। কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, আগামী বছরের গোড়া থেকেই বেসরকারি সংস্থাগুলিকে কড়া টক্করে ফেলবে বিএসএনএল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা সংস্থাটির পুনরুজ্জীবনের জন্য ৮৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করেছে। এর মধ্যে বিএসএনএল-কে ৮৮.৫ হাজার কোটি টাকা মূল্যে ৪-জি/৫-জি স্পেকট্রাম বরাদ্দ করবে কেন্দ্র। এই বরাদ্দের মাধ্যমে দেশের দূরদূরান্তে পৌঁছে যাবে বিএসএনএল। বর্তমানে বিএসএনএলের দেশে গ্রাহক সংখ্যা সাড়ে দশ কোটি, বাজার অংশীদারিত্ব ৯.২৭ শতাংশ। পরিকল্পনায় রয়েছে লক্ষাধিক ৪-জি টাওয়ার বসানো আর এই কাজটির বরাত পেয়েছে দেশের অগ্রণী সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি যার আর্থিক মূল্য ১৫,৭০০ কোটি টাকা। মন্ত্রী অশ্বিনি বৈষ্ণব পরিকল্পনা করেছেন, চারটি ব্যান্ডে মোট ১৫৬০ মেগাহার্টজ স্পেকট্রাম। এর ফলে অতি সত্বর বিএসএনএল গ্রাহকদের ৪-জি/৫-জি পরিষেবা দিতে পারবে। খরচ কম হওয়ায় গ্রাহকরা আবার ফিরবে বিএসএনএলে, এমনই দাবি মন্ত্রীর।

# কোভিড মহামারীর উৎস উহানের জৈবাস্ত্র গবেষণাগার

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** মার্কিন তদন্তকারীদের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে চীনা সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে উহানের গবেষণাগারে

২০১৯-এর শেষের দিকে একটি মিউট্যান্ট ভাইরাস তৈরির গবেষণা চলছিল যা জৈবাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মহামারী শুরুর পর উহান ল্যাব থেকেই কোভিড ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে বলে বিভিন্ন মহল দাবি করলেও তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মার্কিন তদন্তকারীদের দাবি উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজিতে গোপন গবেষণা প্রকল্পে অংশ নেওয়া গবেষকদের ২০১৯-এর নভেম্বরে কোভিডের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। সম্প্রতি এক প্রথম সারির চীনা বিজ্ঞানীও জানিয়েছেন যে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণ হিসেবে উহানের ওই গবেষণাগারে চীনা সেনাবাহিনীর একটি 'জৈব ভাইরাস অস্ত্র' তৈরির প্রকল্পের তত্ত্বটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

# হাফিজ সইদ ঘনিষ্ঠ জঙ্গিনেতার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** জম্মু-কাশ্মীরের কুনওয়ারা জেলার হান্দওয়ারা শহরে সন্ত্রাসবাদে আর্থিক সহায়তার দায়ে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী জহুর আহমেদ শাহ্ ওয়াতালির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলো ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। ২০১৭-র সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের অভিযোগে ইউএপিএ আইনের বিভিন্ন ধারায় এনআইএ ওয়াতালিকে গ্রেপ্তার করে। গত ৩১ মে, নয়াদিল্লিস্থিত পাতিয়ালা হাউস কোর্টের অন্তর্গত বিশেষ এনআইএ আদালতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ। মে মাসের প্রথমদিকে ওয়াতালির আবেদনের প্রেক্ষিতে দিল্লি হাইকোর্ট এই মামলার শুনানি নির্ধারণ করে আগামী ৩ আগস্ট।

তারই মধ্যে বিশেষ এনআইএ আদালতের নির্দেশিকা— RC-10/20/7/NIA/DL, Dated 31.05.2023 মোতাবেক হান্দওয়ারার কথাতপোরা গ্রামে ওয়াতালির জমিজমা-সহ সব স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো। ২০২২-এর মে মাসে এনআইএ-এর ট্রায়াল কোর্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী কাশ্মীরি নেতাদের যথা— ফারুখ আহমেদ দার ওরফে বিট্টা কারাটে, সাব্বির শাহ্, আফতার আহমেদ

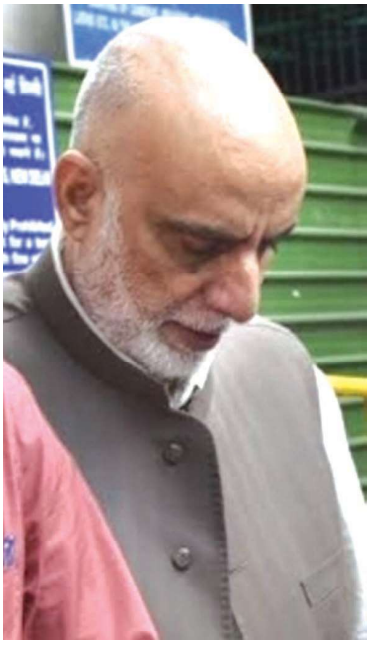

শাহ্, আলতাফ আহমদ শাহ, নায়িম খান, মহম্মদ আকবর খাণ্ডে, রাজা মেহরাজউদ্দিন কালওয়াল, বসির জাহমেদ ভাট, সাবির আহমেদ শা, আবদুল রশিদ শেখ ও জহুর আহমেদ শা ওয়াতালির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ও ইউএপিএ আইনের বিভিন্ন ধারায় চার্জ গঠন করে।

কে এই ওয়াতালি? এনআইএ তদন্ত অনুযায়ী জহুর আহমেদ শাহ্ ওয়াতালি ও অন্যান্যরা সন্ত্রাসবাদী কাজের জন্য তহবিল-সংগ্রহকারী ও মূল আর্থিক মাধ্যম। পাকিস্তান পরিচালিত জঙ্গি সংগঠন এদের আর্থিক মদতদাতা। এছাড়াও স্থানীয় স্তরে আর্থিক অনুদান ইত্যাদি সবরকমের আর্থিক উৎস এরা জঙ্গি তহবিল সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করেছে। তদন্ত চলাকালীন গুলাম মহম্মদ ভাটের বাসভবন থেকে প্রাপ্ত একটি নথিতে প্রকাশ যে, পাক-জঙ্গি সংগঠন জামাত-উদ্- দাওয়া প্রধান হাফিজ সইদের থেকে জহুর আহমেদ শাহ্ ওয়াতালি অর্থ গ্রহণ করেছে ও হুরিয়ত নেতৃত্ব বিচ্ছিন্নতা-বাদীদের ও পাথর- নিক্ষেপকারীদের সেই অর্থ সরবরাহ করেছে।

*With Best*
*Compliments from -*

**A**
**Well Wisher**

## উন্নতির সোপানে উত্তরপ্রদেশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** শীঘ্রই সমগ্র ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত রাজ্য হবে উত্তরপ্রদেশ। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ববর্তী সরকারের আমলে উত্তরপ্রদেশের উন্নয়ন রুদ্ধ হলেও গত ৯ বছরে গোটা ভারতের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে উত্তরপ্রদেশেও হয়ে চলেছে সার্বিক বিকাশ। একটা সময়ে দেশের মধ্যে পিছিয়ে পড়া, অসুস্থ একটি রাজ্যে পরিণত হলেও বর্তমানে রাজ্য জুড়ে একাধিক উন্নয়নমূলক

প্রকল্পের কাজে প্রতিনিয়ত অগ্রগতি ও শিল্পবান্ধব পরিস্থিতির দরুণ এই রাজ্যের উন্নতির শিখরে পৌঁছনো সময়ের অপেক্ষা। ২০১৪ সালের আগে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আমজনতার ক্ষোভ এখন প্রশমিত। উত্তরপ্রদেশের এই উন্নয়নকে মডেল-সম্পর্কিত কাজ তৃণমূল স্তরে গিয়ে মানুষের জন্য করার ব্যাপারে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

## ।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৪৯।।

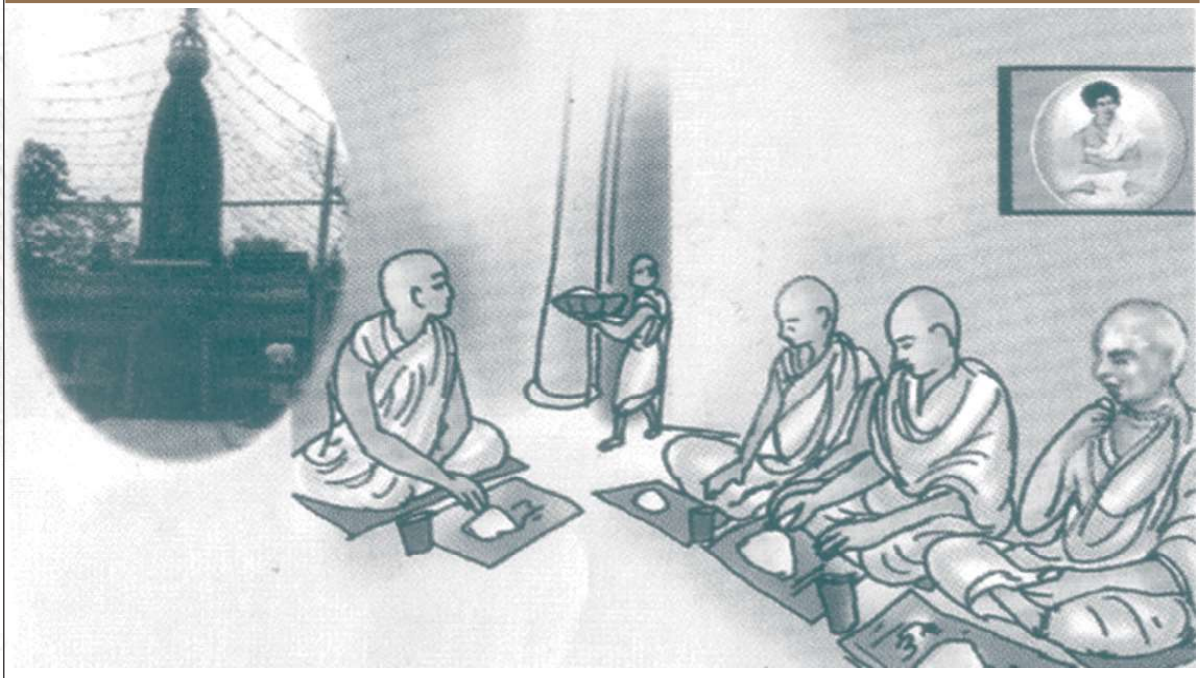

*ব্রহ্মচারীজী ৯ মাস অন্নগ্রহণ করেননি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শ্রী অঙ্গনে ভোগ নিবেদন করে আবার অন্নগ্রহণ করলেন।*

*১৯৪৭-১৯৭১ তাঁর কাজের অন্ত ছিল না। নবদ্বীপে মহানাম মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যেসব হিন্দু মন্দির ভেঙে গিয়েছিল সেগুলি সংস্কারের জন্য 'দেবস্থলী সংস্কার সমিতি' তৈরি করলেন। আবেদন জানালেন দেশের সর্বত্র সব ধর্মগুরু আর জনসাধারণের কাছে।*

*(ক্রমশ)*